রামগোপাল সান্ন্যাল

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী

অনিলকুমার সেনগুপ্ত
সম্পাদিত

রমা প্রকাশনী

প্রথম সংস্করণ ১৮৮৭ খ্রী:

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৪ খ্রী:

বিক্রয়কেন্দ্র :

প্রকাশ ভবন ১৫ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

দে বুক স্টোর ১৩ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ শিল্পী : সুব্রত চৌধুরী

রমা প্রকাশনীর পক্ষে অনুপরঞ্জন চক্রবর্তী কর্তৃক ৭১/৪/২ ডি, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট কলিকাতা ৫ থেকে প্রকাশিত। শীতল চক্রবর্তী কর্তৃক শ্রীনারায়ণ প্রিন্টার্স, ৩/১ বি, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ থেকে মুদ্রিত।

॥ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের অনন্যসাধারণ চিন্তানায়ক এবং সক্রিয় দেশহিতৈষী কর্মযোগীরূপে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম অবিস্মরণীয়। পরবর্তীকালে তাঁকে 'ফাদার অব্ ইণ্ডিয়ান জার্নালিজ্ম্' অর্থাৎ 'ভারতীয় সংবাদিকতার জনক' রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সে-যুগের ইংরাজি-শিক্ষিত দেশীয় সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা মূলতঃ ইংরেজ শাসনের নিশ্চিন্ত ছত্রচ্ছায়ায় থেকে মাঝে মাঝে কিছু আবেদন-নিবেদন এবং সমাজ-সংস্কারের মধ্যেই. সীমাবদ্ধ ছিল। রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ ডিরোজিও-প্রভাবিত কয়েকজন 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর মধ্যে একদা রাজনৈতিক চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটলেও পরবর্তীকালে তা স্তিমিত হয়ে যায়। হরিচশন্দ্র হিন্দু কলেজের প্রভাবমুক্ত স্বগঠিত এবং স্বনির্ভর সম্পূর্ণ এক পৃথক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর রচনাবলী এবং এ-দেশে প্রখ্যাত নীলবিদ্রোহের সময় নিপীড়িত নীলচাষীগণের জন্যে প্রায় একক ভাবে নিরলস সংগ্রামের ইতিহাসই সাক্ষী যে, সমাজ-সংস্কারের চেয়েও ব্রিটিশ শাসনের ঔপনিবেশিক শোষণে জীর্ণ এ-দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংস্কারের আন্দোলন তাঁর কাছে ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সমকালীন শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা তাঁকে কখনোই বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করেনি একথা ব'ললে সেটা অতিরঞ্জন হবে। কিন্তু তাঁর নিজস্ব বলিষ্ঠ চিন্তাধারায় সেই প্রভাব থেকে তিনি নিজেকে অনেকখানি মুক্ত ক'রে নিতে পেরেছিলেন, এ কথা সম্ভবত বলা যায়। ইংরেজের ঔপনিবেশিক শোষণের স্বরূপ তাঁর মতো অত স্পষ্টভাবে সে-সময় আর কেউ উপলব্ধি বা বিশ্লেষণ

করতে পারেন নি। কেবল এ-দেশ নয়, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন প্রভৃতি দেশে ব্রিটিশ শোষণের স্বরূপ নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন হরিশচন্দ্র। কেবল তাই নয়, ভারতীয় নেটিবদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশের অপরিসীম উদ্ধত তাচ্ছিল্যের প্রতিবাদে প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান আলোচনা ক'রে বলিষ্ঠ যুক্তিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সভ্যতা-সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতবর্ষের কাছে সবে সেদিনকার সভ্য-হ'য়ে ওঠা ব্রিটিশের শিক্ষা নেবার অনেক কিছু আছে। এশীয়দের সম্বন্ধে উন্নাসিক শ্বেতাঙ্গ এবং ইউরেশীয়দের অত্যন্ত ঘৃণাব্যঞ্জক মন্তব্যের উত্তরে আরো বহু কথার মধ্যে তিনি ছোট্ট একটি কথা জুড়ে দিয়েছেন, 'বাট যেশাস ওয়াজ অ্যান এশিয়াটিক' (যীশুখৃষ্ট কিন্তু এশীয়-ই ছিলেন)।

১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহকে 'জাতীয় মহাবিদ্রোহ' রূপে অভিহিত করা যায় কি না, এ নিয়ে একালের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে পর্যন্ত মতান্তর আছে। হরিশচন্দ্র কিন্তু বিদ্রোহের সূচনালগ্নেই হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় 'দ্য গ্রেট ইণ্ডিয়ান রিভোল্ট' (মহান জাতীয় বিদ্রোহ) ব'লে অভিহিত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ তারিখে ব্যারাকপুর পল্টন ছাউনিতে ৩৪ নম্বর নেটিব ইনফ্যান্ট্রি বাহিনীর সেপাই মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে বিদ্রোহের সূচনা। সে-বিদ্রোহ দ্রুত দমিত হয় এবং ৮ এপ্রিল তারিখে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়। তার একমাস পরেই ১০মে তারিখে মীরাট পল্টন ছাউনির তিন নম্বর নেটিব ক্যাভালরির (দেশীয় অশ্বারোহী বাহিনী) নেতৃত্বে উত্তরভারতে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো। ১৫ মে তারিখের মধ্যেই সমগ্র উত্তরভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হ'য়ে গেল। ব্রিটিশ শক্তি তখন নিতান্ত অসহায়। তারই পটভূমিতে ২১ মে তারিখে হিন্দু পেট্রিয়টে নির্ভীক সাংবাদিক হরিশচন্দ্র বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা ক'রলেন :—

"There is not a single native of India who does not feel the full weight of the grievances imposed upon him by

the very existence of the British rule in India—grievances inseperable from subjection to a foreign rule."   [The Country and the Government]

"আজ ভারতবর্ষের এমন একজনও অধিবাসী নেই যে কিনা এদেশে ব্রিটিশশাসনজনিত নিষ্পেষণের দুঃসহ গুরুভারকে অনুভব করে না। বৈদেশিক শাসনের কাছে অধীনতা স্বীকারের গ্লানির সঙ্গে সেই দুঃসহ গুরুভারের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।"

আমরা যতদূর জানি, হরিশের লেখনীতে ব্রিটিশ শাসনের দুর্বিষহ নিষ্পেষণ থেকে মুক্তিলাভের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা এই ক'ছত্রে যত দৃপ্তভাবে ঘোষিত হয়েছে, এর আগে সেই দৃপ্ত তেজে আর কেউ ঘোষণা করেননি বা করতে পারেননি। প্রখ্যাত হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর কাব্যে স্বাধীনতা-স্পৃহার আকাঙ্ক্ষা প্রথম লক্ষ্য করা গেছে। অতঃপর হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষের কবিতায় এবং তাঁর পরবর্তীকালে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজপুত কাহিনীভিত্তিক'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যেও 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' ইত্যাদি সুপরিচিত পংক্তিগুলি আমরা পেয়েছি। কিন্তু ডিরোজিও, কাশীপ্রসাদ এবং রঙ্গলাল এঁদের আকাঙ্ক্ষা কাব্যাবেগ বা রূপকাশ্রয়ে প্রকাশিত হ'য়েছে। হরিশের রচনায় কোন রূপক নেই। তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনজনিত পরাধীনতার জ্বালাকে একেবারে নামোল্লেখসহ তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু, হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক গিরীশচন্দ্র ঘোষ মুখার্জিস ম্যাগাজিন পত্রিকায় (শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত) গভীর আবেগে লিখেছিলেন, "তাঁরই জন্য অতি সম্প্রতি আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য অনুধাবন করতে শিখেছি।"

'The Future of Indian Government' নিবন্ধে হরিশ দৃপ্ত বিশ্বাসে ঘোষণা ক'রেছেন, "The time is nearly to come when all Indian

questions must be solved by Indians"

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশভারতের মেট্রোপলিস কলকাতার শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় বিদ্রোহী সেপাইদের উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো কটূক্তি বর্ষণ ক'রে নিজেদের ব্রিটিশরাজভক্তি প্রদর্শনের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছিলেন। হরিশচন্দ্রও বিদ্রোহী সেপাইদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু লিখেছেন, হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় তার সাক্ষ্য আছে। কিন্তু বিদ্রোহ সংক্রান্ত পূর্বের এবং পরবর্তীকালের রচনাগুলি বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের মনে হয়েছে, পূর্বেকার রচনাগুলির উপর সমকালীন শিক্ষিত বাঙালী মানসিকতার প্রভাব একটি কারণ। কিন্তু অন্য একটি কারণ সম্ভবত দেশের সেই সংকটকালে হিংস্র, উন্মত্ত নেটিবরক্তপিপাসু 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', 'বেঙ্গল হরকরা', 'ইংলিশম্যান', 'ঢাকা নিউজ'প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত পত্রপত্রিকার তীব্র প্ররোচনামূলক রচনাদি প্রকাশ এবং ইয়োরেশিয়ান (অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান) সহ সমগ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজের জ্বলন্ত আক্রোশ থেকে ক্যানিং-এর মতো স্থিরবুদ্ধি ভাইসরয়কে যথাসাধ্য রক্ষা করবার প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির আশ্রয়গ্রহণ। ক্যানিংও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি। কিন্তু তিনি এলেনবরা, অকল্যাণ্ড কিম্বা ডালহৌসির মতো প্রচণ্ড উগ্র এবং অবিবেচক ছিলেন না। ক্যানিং-এর অপসারণ দাবী ক'রে এদেশের ক্ষিপ্ত, উন্মাদ শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় ইংল্যাণ্ডে কর্তৃপক্ষের কাছে যে পিটিশন পাঠিয়েছিলেন, তা যদি গৃহীত হত এবং ক্যানিংয়ের স্থানে একজন অকল্যাণ্ড, এলেনবরা কিম্বা ব্রিগেডিয়ার নীল-এর মতো নির্মম, রক্তপিপাসু ভাইসরয় নিযুক্ত হ'তেন তাহলে বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল উত্তরভারতে রক্তবন্যার আরো কত ভয়ংকর স্রোত যে ব'য়ে যেতো, তা অনুমান করাও কঠিন। হরিশ যে বিদ্রোহের প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ, ১৮৫৮ সালের ৬ মে তারিখের হিন্দু পেট্রীয়টে লিখেছেন :—

"History will, we conceive, take a very different view of the facts of the Great Indian Revolt of 1857 from what

contemporaries have taken of them"

[The Atrocities and Retribution]

"আমাদের বিশ্বাস, ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহকে সমসাময়িক ব্যক্তিগণ যে দৃষ্টিতে দেখছেন, ভবিষ্যতে ইতিহাস তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করবে।"

১৮৫৮ সালের জুন মাসে লিখিত একটি নিবন্ধে বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত ক'রেছেন :—

"...The sepoys revolted as a matter of necessary consequence. ...The sepoys began to fear not only for their caste and their pay, but likewise for their lands. They struck the first blow . The feudal aristocrats urged them on. When a certain measure of progress was made, the aristocracy put itself at the head of the movement and the sepoy mutiny became the Indian rebellion'.

[The Causes of Mutiny]

"সেপাইদের বিদ্রোহ এক অনিবার্য কার্য-কারণেরই পরিণতি। কেবলমাত্র জাতি-বর্ণ এবং বেতনের প্রশ্নই তাদের বিদ্রোহের একমাত্র কারণ নয়। তাদের জমি-জমার [কোম্পানির খাস ক'রে নেবার ভীতি] জন্যে আতংকও ছিল বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। সেপাইরা প্রথমে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রলো। অভিজাত সামন্ত রাজন্যবর্গ তাদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। তারপর বিদ্রোহ যখন সাফল্যের একটা স্তরে পৌছলো ঠিক তখনই সামন্তবর্গ এগিয়ে এসে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রলেন। এবং এইভাবেই সিপাহী বিদ্রোহ সর্বভারতীয় বিদ্রোহে পরিণত হল।"

এনফিল্ড রাইফেলের চর্বি মাখানো কার্তুজ একটা উপলক্ষ্য মাত্র। বিদ্রোহের মূল কারণটি কিন্তু কৃষক মানসিকতার মধ্যে নিহিত। ডালহৌসির

"ডক্‌ট্রিন অব ল্যাপ্‌স্‌' বা স্বত্ববিলোপ আইনের প্রয়োগে সামন্তরাজন্যবর্গ আগেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁর সর্বশেষ কীর্তি 'অযোধ্যা অধিগ্রহণ'-এর পর সেপাইদের মনে এই ভীতি ক্রমে গভীর হচ্ছিল যে, কোম্পানি সরকার যে কোনদিন তাদের পারিবারিক জমিজমাও খাস ক'রে নিতে পারে। কোম্পানির দেশীয় সেনাবাহিনীতে অযোধ্যা এবং রোহিলখণ্ডের কৃষকঘরের সন্তানের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি। জমিজমা খাস হ'য়ে যাওয়ার ভয় তাদের মনেই প্রথম জাগে। চর্বিমাখানো কার্তুজ যে বিদ্রোহের আসল কারণ নয় তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ, বিদ্রোহকালে ব্রিটিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ক'রে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সেপাইরা সেই কার্তুজ দিয়েই এনফিল্ড রাইফেল ব্যবহার করেছে। সেপাই-বিদ্রোহ যে প্রকৃতপক্ষে কৃষকবিদ্রোহ, এটা হরিশ উপলব্ধি করেছিলেন। সেই কারণেই তিনি সোচ্চার কণ্ঠে একে 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ' ব'লে ঘোষণা ক'রতে দ্বিধা করেন নি।

॥ ২ ॥

হরিশচন্দ্রের আয়ুষ্কাল মাত্র ৩৭ বছর (এপ্রিল, ১৮২৪ থেকে জুন, ১৮৬১)। এই স্বল্প-জীবৎকালের মধ্যেই নিতান্ত দরিদ্র, মাতুলগৃহে প্রতিপালিত হরিশচন্দ্র কিভাবে কত কষ্ট স্বীকার ক'রে, কি বিপুল পরিশ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং অন্তর্নিহিত তেজোদৃপ্ত ব্যক্তিত্বের জোরে তদানীন্তন কালের এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিরূপে গণ্য হ'লেন, তা বিস্ময়কর।

হরিশচন্দ্রের জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরবময় পর্ব নীলবিদ্রোহের কালে তাঁর ভূমিকায়। শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের দ্বারা নিপীড়িত বাঙলার নীলচাষীগণের জন্যে তিনি যা করেছেন তা উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে অন্যতম উজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁর অকালমৃত্যু এবং নীলদর্পণ নাটকের ইংরিজি অনুবাদ প্রকাশ প্রসঙ্গে রেভারেণ্ড জেম্‌স্‌ লঙ-এর বিচার-প্রহসন ও কারাদণ্ডকে কেন্দ্র ক'রে কবিয়াল বিদ্যা ভূনী রচিত 'নীল বানরে সোনার বাঙ্গালা করল এবার

ছারেখার। অসময়ে হরিশ মল লণ্ডের হল কারাগার ইত্যাদি' অতিপরিচিত গানটির মধ্যে বাঙলার নিপীড়িত চাষী তার মনের কথা খুঁজে পেয়ে স্বজন বিয়োগব্যথায় চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে।

অনন্যসাধারণ চিন্তানায়ক হরিশচন্দ্র 'এক্সট্রিমিস্ট' বা চরমপন্থী ব'লে চিহ্নিত হয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, বিদ্যাসাগর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ স্বল্প কয়েকজন ভিন্ন কেউ বিশেষত জমিদার গোষ্ঠী তাঁকে প্রীতির চোখে দেখেন নি। বলা যায়, হরিশের মৃত্যুর পর তাঁরা 'আপদ গেল' ব'লে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন।

উপরোক্ত তালিকায় আমি হরিশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু গিরীশচন্দ্র ঘোষ (হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদক), কিশোরীচাঁদ মিত্র ('ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রিকার সম্পাদক) ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের নামোল্লেখ করিনি। এঁদের সঙ্গে হরিশের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যদিও রাজনৈতিক মতে মিল ছিল না কিন্তু তার জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি।

হরিশ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। নীলবিদ্রোহের সময় উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সক্রিয় চেষ্টায় নির্যাতিত নীলচাষীগণের মামলা ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদনক্রমে 'ইণ্ডিগো ফাণ্ড' নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়। নীলচাষীগণের প্রয়োজনে হরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত উপার্জনের টাকা তো প্রতিমাসেই প্রায় সম্পূর্ণ ব্যয় হ'য়ে যেতো; অধিকন্তু উক্ত তহবিলের প্রায় সব টাকাই ব্যয় হ'য়ে অবশিষ্ট সামান্য কিছু হরিশের কাছে গচ্ছিত ছিল। সে-টাকার যথার্থ পরিমাণ আমরা জানি না। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে যেটুকু বোঝা যায় তাতে মনে হয় নিতান্তই স্বল্প পরিমাণ টাকা। হরিশচন্দ্র যখন মৃত্যুশয্যায় তখন সেই অবশিষ্ট টাকা তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করে নেবার জন্যে ব্রিটিশ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কতিপয় অভিজাত শ্রেণীর সদস্য এবং জমিদারবর্গ এবং তাঁদের বিশ্বস্ত সেবক কৃষ্ণদাস পালের কুৎসিত আচরণ বিস্ময়জনক। উপরন্তু, নদীয়া জেলার হরমনি নাম্নী এক গ্রাম্য বধুকে বলপূর্বক হরণ ও ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত কাচিকাটা নীলকুঠির কুখ্যাত নীলকর আর্চিবল্ড হিল্‌সের মামলা খারিজ হ'য়ে যাওয়ার পর হিল্‌স্ হরিশ্চন্দ্রের বিরুদ্ধে দশ হাজার টাকার খেসারৎ দাবী ক'রে আলিপুর আদালতের সদর আমীন (সাবজজ) তারকনাথ সেনের এজলাশে হুকুমত বাহার অর্থাৎ মানহানির মামলা দায়ের করে। কারণ, তার কুকীর্তির বিস্তারিত কাহিনী হরিশ হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশ করেন। এই মামলার পরিণতি সম্বন্ধে হরিশ্চন্দ্রের এই জীবনী গ্রন্থে লেখক অতি সংক্ষেপে বলেছেন, 'হরিশের মৃত্যুর পর নীলকরগণ একতরফা ডিক্রি পায়।' এই জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের দু'বছর পরে ১৮৮৯ সালে লেখক জীবিত ও মৃত কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তির জীবনীর এক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইংরিজী ভাষায় লিখিত এই জীবনীতে হরিশচন্দ্র সম্বন্ধে আরো কয়েকটি অতিরিক্ত তথ্য আছে। আর্চিবল্ড হিল্‌সের মামলা প্রসঙ্গে তার পরিণতি সম্বন্ধে লেখক আরো একটু বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। সেই গ্রন্থে 'হিজ ক্যারেক্টার' শীর্ষক অধ্যায়ে রামগোপাল লিখেছেন :

"He knew perfectly well that neither his countrymen nor the ryots would help him in the hour of trial. One word of apology from him would have satisfied the enraged planters of Bengal. Yet he manfully stood to his gun and refused to recant his words. The consequence was that the Planters got a decree against him from the Subordinate Judge of Alipur and his house was attached and put to the auctioneer's hammer. All these took place immediately after his

death…" [A General Biography of Bengal Celebrities]

"তিনি (হরিশচন্দ্র) স্পষ্টভাবেই জানতেন, মামলার বিচারকালে দেশবাসী বা রায়তগণের পক্ষ থেকে কোনো সহায়তাই তিনি পাবেন না। তাঁর মুখ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক একটিমাত্র শব্দ উচ্চারিত হ'লেই বাঙলার নীলকরগণের প্রজ্জলিত ক্রোধবহ্নি নির্বাপিত হয়ে যেতো। কিন্তু তিনি তাঁর বক্তব্য (হিন্দু পেট্রিয়টে মুদ্রিত বিবরণ) প্রত্যাহারে দৃঢ় অসম্মতি জ্ঞাপন ক'রে নিজ সংকল্পে অটল রইলেন। ফলে, মামলার রায়ে নীলকরেরা ডিক্রি পেলো এবং টাকা আদায়ের জন্য শেষপর্যন্ত তাঁর বসতবাড়ি নীলামে উঠলো। এই ঘটনাগুলি তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই ঘটে।"

পরবর্তী কালে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল প্রমুখ অনেকেই এই মামলার সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার হ'ল, মামলায় হরিশ আপোস করেননি। মামলা চলাকালেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু প্রতিহিংসায় উন্মত্ত আর্চিবল্ড হিল্‌স মৃত হরিশচন্দ্রের স্থানে তাঁর বিধবা পত্নীকে বিবাদী ক'রে মামলা চালিয়ে যেতে থাকে। নিঃস্ব অবস্থাতেই হরিশের মৃত্যু হয়। তাঁর বিধবা পত্নী শেষ পর্যন্ত প্রবল পরাক্রান্ত নীলকরদের সঙ্গে পেরে উঠতে পারবেন না জেনে মামলার ব্যয় বাবদ একহাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিরুপায় ভাবে আপোস করেন। কিন্তু সেই একহাজার টাকা দেবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। শেষ পর্যন্ত বাড়ি ক্রোকের হুকুম জারি হ'ল। অবশ্য কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায় তাঁদের প্রদত্ত চাঁদার টাকায় একহাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত হরিশচন্দ্রের বাড়িটি ক্রোকের কবল থেকে রেহাই পায়। সেই ঐতিহাসিক বাড়িটি এখনো ভবানীপুরে হরিশ মুখার্জি রোডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য পরবর্তীকালে বাড়ির স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়েছে।

এই দু'টি মর্মান্তিক ঘটনার (ইণ্ডিগো কাণ্ড এবং মানহানির মামলা) পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বিবেকহীনতা এবং নির্মম

নির্লিপ্ততায় হরিশের অকৃত্রিম সুহৃদ গিরীশচন্দ্র ঘোষ বড়ো দুঃখে, বড়ো ক্ষোভে একটি নিবন্ধে লিখেছেন :

"The Law costs of the famous libel case against the Patriot threatens to deprive his bereved mother and wife of even their homested. A warrant has been issued for the recovery of the amount by distress, and the British Indian Association which scrupled not to extort from its dying colleague the debris of the Indigo fund, calmly looks on whilst the penalty of the boldest Indigo article ever penned by Hurrish Chunder is being enforced againgt his widow. The ingratitude is intolerable. We call upon the country atlarge to deaden its incidence by affording immediate relief from the pressing difficulty." [How Patriots Are Served]

"পেট্রিয়টের (হরিশ্চন্দ্রের) বিরুদ্ধে সেই সুপরিচিত মানহানির মামলার আর্থিক দায়দায়িত্ব অবশেষে হরিশের শোকগ্রস্তা জননী এবং বিধবা পত্নীকে আশ্রয়চ্যুত করতে উদ্যত হয়েছে। প্রাপ্য অর্থ ক্রোকের (হরিশের বাড়ি) সাহায্যে আদায়ের জন্য আদালত থেকে শমন জারি করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বিবেক বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী তাঁদের সহকর্মীর নিকট থেকে নীলবিষয়ক তহবিলের অবশিষ্ট সামান্য অর্থ মুচড়ে আদায় করবার প্রচেষ্টায় বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেনি, আজ যখন হরিশের লেখনী নিঃসৃত নীলবিষয়ক বলিষ্ঠতম নিবন্ধের দণ্ডস্বরূপ সব দায়দায়িত্ব তাঁর অসহায়া বিধবা পত্নীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন সেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অদ্ভুত নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাব অবলম্বন করেছেন। এই অকৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত অসহনীয়। আমরা সমগ্র দেশবাসীর নিকট আবেদন

জানাচ্ছি, তাঁরা যেন তাঁদের সহযোগিতা'র হস্ত সাধ্যমতো প্রসারিত ক'রে এগিয়ে আসেন যাতে এই আসন্ন বিপদ থেকে তাঁদের (হরিশের মা এবং বিধবা স্ত্রী) রক্ষা করা যায়।"

গিরীশচন্দ্রের এই বেদনামথিত কথাগুলির পর হরিশচন্দ্রের সম্বন্ধে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মনোভাব প্রসঙ্গে আর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গিরীশচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং আর স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির সহৃদয় সাহায্যেই হরিশচন্দ্রের সেই বাড়িটি আর ক্রোক হয়নি, সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

রামগোপাল সান্যাল রচিত 'হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী' বাঙলাভাষায় রচিত হরিশচন্দ্রের প্রথম জীবনচরিত। তাই পথিকৃৎ জীবনীকারের পূর্ণ সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। তাঁর ৫৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকাখানিকে পূর্ণাঙ্গ জীবনী ব'লে অভিহিত করা চলে না এবং তিনিও সেরকম দাবী জানাননি। কিন্তু লেখক যে নিষ্ঠাভরে হরিশচন্দ্রের মতো অনন্যসাধারণ চিন্তানায়ক এবং নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকের সম্বন্ধে এই পুস্তিকা লিখে রেখে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, তাঁর সেই আগ্রহের মূল্য অনেকখানি। এই পুস্তিকায় বিশদভাবে হরিশচন্দ্রের পর্যায়ক্রমিক জীবন-কাহিনী বর্ণিত হয়নি। হরিশের ৩৭ বছর বয়সে সমাপ্ত জীবনের একটি রেখাচিত্র মাত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। তা ভিন্ন, কয়েকটি বিক্ষিপ্ত কাহিনী এবং ঘটনার বিবরণ তিনি দিয়েছেন। ভূমিকায় লেখক নিজেই ব'লেছেন "এতদিন পরে তাঁহার জীবনী সম্যকরূপে লেখা অনেক কারণে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ হরিশের সহবর্তী লোকের অনেকেরই পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ হরিশের লিখিত হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজ বা চিঠিপত্রাদি প্রায় কিছুই পাওয়া যাওয়া যায় না। এই কারণে তাঁহার

জীবনের আনুপূর্বিক বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন।"

প্রকৃতপক্ষে, রামগোপাল সান্যাল যখন এই জীবনী লেখেন, তখনকার দিনে আমাদের এদেশীয় লেখকগণের মধ্যে তথ্যাদির ব্যাপক অনুসন্ধান, বিচার-বিশ্লেষণ এবং তার ভিত্তিতে রচনার রীতি তেমনভাবে প্রচলিত হয় নি। কিছু ঐতিহাসিক তথ্য, কিছু বা সমসাময়িক ব্যক্তি-প্রদত্ত বিবরণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বহুপ্রচলিত কোনো কোনো জনশ্রুতিকেও লেখকেরা তাঁদের রচনার উপাদান হিসাবে সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালের গবেষণায় এইরকম কিছু কিছু জনশ্রুতি ভ্রান্ত ব'লেও প্রমাণিত হয়েছে। সে যাই হোক, রামগোপালের এই জীবনী রচনাকালের পূর্বে হরিশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বহু ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায়, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সংগ্রহ করা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু হরিশচন্দ্র-সম্পাদিত হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার কপি যে একেবারে দুষ্প্রাপ্য ছিল, তা সম্ভবত নয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জমিদার সদস্যবর্গ এবং তাঁদের অতি বিশ্বস্ত সেবক কৃষ্ণদাস পাল হরিশচন্দ্রের স্মৃতিকে লোপ ক'রে দেবার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখেন নি। সেখানে অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েশনের গ্রন্থাগারে এবং তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে (বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরি) যদি হিন্দু পেট্রিয়টের কপি নাও থেকে থাকে তা'হলেও গিরীশচন্দ্র ঘোষের ব্যক্তিগত সংগ্রহে (যদিও গিরীশচন্দ্র তখন জীবিত নেই) হিন্দু পেট্রিয়টের ফাইল ছিল। গিরীশচন্দ্রের পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত সেই গ্রন্থাগারে হিন্দু পেট্রিয়টের ফাইল আমরা দেখেছি। এখন অবশ্য নেই। কারণ, সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরবর্তী-কালের গবেষকবৃন্দের সুবিধার্থে সেগুলি জাতীয় গ্রন্থাগারে স্থানান্তরিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থাগার ছাড়াও উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি এবং কোনো কোনো গৃহস্থের বাড়িতেও ছিল ব'লে শুনেছি। তবে এই জীবনী রচনার সময় তিনি কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন না ব'লেই হয়তো এই সব সূত্র থেকে সাহায্য গ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি বলে মনে হয়। রামগোপাল সান্যালের পরবর্তী

ইংরিজি ও বাঙলা রচনাগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে, প্রামাণ্য তথ্য সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত তাঁর পূর্বোল্লিখিত BENGAL CELEBRITIES গ্রন্থে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

ঐতিহাসিক বিচারে রামগোপাল সান্যাল রচিত হরিশচন্দ্রের এই জীবনী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে হরিশচন্দ্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু বা গবেষকদের নিকট এই জীবনী আকর-গ্রন্থরূপেই স্বীকৃত হয়েছে। পুস্তিকার মধ্যে কোথাও কোথাও লেখকের ব্রিটিশরাজভক্তির মনোভাব স্পষ্ট এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি হরিশচন্দ্রের কর্ম বা রচনাদির ব্যাখ্যা করেছেন। এই মানসিকতা এ-যুগে আমাদের কাছে অবাঞ্ছনীয় মনে হ'লেও লেখকের সমসাময়িক যুগ এবং তার বাস্তব পটভূমিকাতে এই মনোভাবকেই স্বাভাবিক মনে রেখে লেখকের রচনা আমাদের পড়তে হবে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা এবং আস্থা সে-যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সেই কারণেই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকালে বিদ্রোহী সেপাইদের সম্বন্ধে ধর্মান্ধ, অশিক্ষিত, গোঁয়ার, দেশের পক্ষে অনিষ্টকারী ইত্যাদি ধারণাই ছিল ব্যাপকভাবে প্রচলিত। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যায় যে, হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ক্রোকের কবল থেকে নিস্তার-পাওয়া হরিশচন্দ্রের বাড়িটিতে তাঁর উদ্দেশ্যে দেশবাসীর পক্ষ থেকে যে প্রস্তর-ফলক স্থাপন করা হয়েছিল, তাতে এই কথা ক'টি যুক্ত আছে :—

"যিনি একাধারে প্রজাবৃন্দের শরণ্য পৃষ্টপোষক ও বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অবলম্বনীয় স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, সেই মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন এই কীর্তিস্তম্ভ তদীয় চিরকৃতজ্ঞ স্বদেশবাসিগণ কর্তৃক সাধারণের প্রদত্ত অর্থদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল।"

উক্ত প্রস্তর ফলকের সম্পূর্ণ ইংরিজি বয়ান এবং তার বাঙলা অনুবাদ Selections from the writings of Hurrish Chunder Mookerji (1910) গ্রন্থে আছে। হরিশচন্দ্রের বাড়ির স্বত্ব পরবর্তীকালে

হস্তান্তরিত হলেও ভবানীপুরে হরিশ মুখার্জি রোডের ওপর সেই প্রস্তরফলকসহ বাড়িটি এখনো বিদ্যমান।

এই জীবনীর ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'এপর্যন্ত (অর্থাৎ ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত) তাঁহার জীবনী ইংরাজীতে কিম্বা বাঙ্গালায় কেহই লিখিতে প্রয়াস পান নাই।" লেখকের এই ধারণা কিন্তু সঠিক নয়। যদিও বাঙলাভাষায় তিনিই নিঃসন্দেহে হরিশচন্দ্রের প্রথম জীবনী-রচয়িতা, কিন্তু হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর (১৪ জুন, ১৮৬১) পর দু'বছরের মধ্যেই বোম্বাই থেকে ইংরিজিভাষায় হরিশচন্দ্রের একখানি জীবনী গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় (মার্চ, ১৮৬৩)। লেখক বোম্বাইয়ের এলফিনস্টোন কলেজের অবসরপ্রাপ্ত জনৈক পার্শী অধ্যাপক—ফ্রামজী বোমানজি। তাঁর গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ নাম বেশ দীর্ঘ :—

"The Lights And Shades Of The East Or a Study Of the Life Of Baboo Haris Chunder; And Passing Thoughts on India And Its People : Their present and Future (1863)"

লেখক ফ্রামজী বোমানজীও যে তাঁর গ্রন্থে হরিশচন্দ্র সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্য দিতে পেরেছেন, এমন নয়। সুদূর বোম্বাইতে ব'সে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, সে-কথা ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও হরিশচন্দ্রের চিন্তা-চেতনার স্বকীয়তা এবং সমকালীন যুগের চিন্তাধারা থেকে অনেক অগ্রসর চিন্তাভাবনার বৈশিষ্ট্যকে লেখক শ্রদ্ধা এবং বিশ্লেষণের দ্বারা প্রোজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন। হরিশচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা তাঁর গ্রন্থের ১৬৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অবশিষ্ট অংশের আলোচ্য বিষয় ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। বোম্বাই-নিবাসী এক প্রবীণ বুদ্ধিজীবীর মনের ওপর হরিশচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনা এবং ব্যক্তিত্বের স্বরূপ কিভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তার নিদর্শন স্বরূপ দুটি মাত্র উক্তি এখানে দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি লিখেছেন :—

"...the difference between the feeble and strong, the insignificant and the great, has always been FIRMNESS —UNSHAKING DETERMINTION ; —a purpose once fixed in mind, and then DETH OR VICTORY." [THE LIGHTS AND SHADES (1863), ch. VII, P. I51]

*　　　　*　　　　*

"He is...of firm purpose, diligent perseverance ; ...true to his trust, true to himself ; honouring and honoured, loving and beloved. ..He was a political reformer, without being the social and the moral reformer also ; and in this respect he stands in a painful contrast with another noble Indian—the great Rammohun Roy, burried thirty years ago in Bristol." [Ibid, Ch VIII, p. 157—158]

রামগোপাল সান্যাল বাংলা জীবনী রচনার ছ'বছর পরে BENGAL CELEBRITIES (1889) নামে যে-গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তার ভূমিকায় ক্রামজী বোমানজীর গ্রন্থের উল্লেখ ক'রেছেন। সুতরাং অনুমান করা যায়, বাঙলা জীবনী লেখার আগে যে কোনো কারণেই হোক, উক্ত গ্রন্থখানির সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন না। নচেৎ, সে-কথা অবশ্যই উল্লেখ করতেন।

একদা-বিস্মৃতপ্রায় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে গত কয়েক দশক যাবৎ গবেষক এবং জিজ্ঞাসু মহলে আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। বস্তুত, হরিশচন্দ্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ে চিন্তাধারার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যুক্তিনিষ্ঠ সঠিক মূল্যায়ন এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। ইদানিং তাঁর সম্বন্ধে গবেষক-বুদ্ধিজীবী মহলে কিছু মতভেদও দেখা দিয়েছে। এক গোষ্ঠী

বুদ্ধিজীবীর মতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে হরিশচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনা এবং ব্যাপ্ত মানবতাবোধ সমকালীন শিক্ষিত ভারতীয় বা 'এজুকেটেড নেটিব' গণের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিস্ময়করভাবে প্রগতিবাদী। এই অভিমত পোষণকারী বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাই বেশি। অন্যদিকে স্বল্প সংখ্যক গবেষক বুদ্ধিজীবীর ব্যাখ্যা অনুসারে, নিপীড়িত নীলচাষীদের জন্যে হরিশচন্দ্র প্রাণপাতই করুন আর যাই করুন, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং সাংবাদিকতার পশ্চাতে ছিল অকৃত্রিম ব্রিটিশরাজভক্তি এবং দেশীয় জমিদার শ্রেণীর প্রতি আমরণ আনুগত্য। এই মতবাদে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীগণ হরিশ্চন্দ্রের নীলকরগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নির্যাতিত নীলচাষী রায়তগণের প্রতি অকৃপণ মমত্ববোধের অন্তরালেও ব্রিটিশসাম্রাজ্যের এবং দেশীয় জমিদারবর্গের স্বার্থরক্ষার আকুল আগ্রহ আবিষ্কার ক'রেছেন। ভবিষ্যৎকালের মানুষ কোন সিদ্ধান্তকে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ ক'রবে তা এখন বলা সম্ভব নয়। এখানে আমরা এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদের উল্লেখটুকু মাত্র ক'রে রাখছি।

॥ ৪ ॥

রামগোপাল সান্যাল ভূমিকায় ব'লেই রেখেছেন যে সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেই কারণেই, পরবর্তীকালের গবেষণায় যে-সব নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তাঁর রচনায় সেগুলি অনুল্লিখিত, অসম্পূর্ণ কিম্বা সংশয়সূচক বিবরণ ব'লে আমাদের মনে হচ্ছে—রামগোপালের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা এখানে সেই রকম কয়েকটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করছি। আমাদের প্রকাশিত এই জীবনীগ্রন্থের আকার-আয়তন লেখকের মূল পুস্তিকার আকার-আয়তন থেকে কিঞ্চিৎ পৃথক হওয়ায় মূল গ্রন্থের পত্রাংক অনুসারেই সেগুলিকে বিন্যাস করা হল।

(ক) পৃষ্ঠা-১। হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস প্রসঙ্গে রামগোপাল লিখেছেন, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের বাবু মধুসূদন রায়ের

কালাকার ষ্ট্রীটস্থ ছাপাখানা থেকে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। হিন্দু পেট্রিয়টের প্রথম প্রকাশ বৃহস্পতিবার, ৬ জানুয়ারী, ১৮৫৩। সুতরাং তারিখ উল্লেখ না করলেও পত্রিকা প্রকাশের সময় সম্বন্ধে তাঁর প্রদত্ত বিবরণ নির্ভুল। কিন্তু মধুসূদন রায় পত্রিকার স্বত্ব হস্তান্তরিত করবার আগে পর্যন্ত কালাকার ষ্ট্রীটের প্রেসেই পত্রিকা ছাপা হত কিনা, সে-সম্বন্ধে লেখক স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। দেখা যাচ্ছে, ১৮৫৪ সালের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার মুদ্রক, প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারী রূপে সেই বাবু মধুসূদন রায়েরই নাম ছাপা আছে এবং ঠিকানা আছে ১৩৬, রাধাবাজার ষ্ট্রীট। সম্ভবত কালাকার ষ্ট্রীটের ছাপাখানা থেকে পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এবং ১৮৫৩ ও ১৮৫৪ সালের মধ্যে কোনো সময় ছাপাখানা রাধাবাজার ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

(খ) লেখক জানিয়েছেন যে, ভবানীপুর নিবাসী জনৈক ব্রজলাল চক্রবর্তীর নিকট তিনি শুনেছিলেন যে, হিন্দু পেট্রিয়টের স্বত্বাধিকারী বাবু মধুসূদন রায় ১৮৫৪ সালে হরিশচন্দ্রের নিকট পত্রিকার স্বত্ব বিক্রয় করেন এবং সেই বছরেই উক্ত পত্রিকা ভবানীপুরের সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী প্রেস-এ ছাপা আরম্ভ হয়। ব্রজলাল চক্রবর্তী-প্রদত্ত বিবরণ সঠিক নয়। অন্যান্য প্রামাণ্য সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে, পত্রিকার হস্তান্তর পর্ব সম্পাদিত হয় ১৮৫৫ সালের জুন মাসে। এবং তার পর থেকেই উক্ত ছাপাখানায় ছাপা আরম্ভ হয়। তাও হরিশচন্দ্র নিজে সরকারি দপ্তরে কর্মরত ব'লে শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর্গের পরামর্শে নিজের নামে স্বত্ব ক্রয় না ক'রে জ্যেষ্ঠভ্রাতা হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে ক্রয় করেন।

(গ) পৃষ্ঠা-৯। হরিশচন্দ্রের বিবাহ প্রসঙ্গে হরিশের প্রথমা পত্নী মোক্ষদা দেবীর পিতার নাম লেখক কেবলমাত্র গোবিন্দচন্দ্র ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন। গোবিন্দচন্দ্রের পদবী ছিল 'চট্টোপাধ্যায়।'

(ঘ) 'হরিশ্চন্দ্রের সম্পাদকীয় কার্য' প্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন, তাঁর প্রথম

রচনা প্রকাশিত হয় কব হ্যারি সম্পাদিত ইংলিশম্যান পত্রিকায়। মনে হয়, এক্ষেত্রেও লেখক সরল বিশ্বাসে কোন ব্যক্তি কথিত এই অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। হরিশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিরীশচন্দ্রের রচনা এবং অন্যান্য সূত্র থেকে যতদূর জানা যায়, হরিশচন্দ্রের প্রথম রচনা প্রকাশিত হ'য়েছিল বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' নামক পত্রিকায়। ফ্রামজী বোমানজীও এই তথ্য সমর্থন ক'রেছেন।

(ঙ) পৃষ্ঠা-১১। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার গ্রাহক কিম্বা ক্রেতার প্রদেয় মূল্য প্রসঙ্গে রামগোপাল লিখেছেন, "কাগজের মাসুল প্রতি সপ্তাহে দু' আনা এবং ইহার অগ্রিম দেয় মূল্য (সম্ভবত বার্ষিক) দশটাকা।" এতে কিন্তু সাপ্তাহিক পত্রিকার মাশুলের হিসেব ঠিক মিলছে না। মাসে দু'আনা হলে (গ্রাহকদের হ্রাস মূল্যের কথা ছেড়ে দিলেও) মাসে হয় আট আনা এবং বছরে ছ'টাকা। ১৮৫৪ সালের হিন্দু পেট্রীয়ট পত্রিকায় মুদ্রিত চাঁদার হার দেখা যাচ্ছে, প্রতি সংখ্যা আট আনা, মাসিক একটাকা, ষান্মাসিক চার টাকা এবং বার্ষিক আটটাকা। প্রথম উল্লিখিত হারটি কি ডাকমাশুল সহ অথবা দ্বিতীয়টি ডাকমাশুল সহ হ'লেও নিয়মিত গ্রাহকদের জন্যে হ্রাসমূল্যের হার, এটা আমাদের পক্ষে বলা কঠিন। দ্বিতীয়টি অবশ্য ব্যবসায়িক রীতির সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। হয়ত এমনও হ'তে পারে, রামগোপাল যে-রকম বলেছেন, পত্রিকার প্রথম প্রকাশের সময় প্রতি সংখ্যার মূল্য সেইরকম দু'আনাই ছিল, পরে সংখ্যা প্রতি মূল্য আট আনা ধার্য হয়।

(চ) পৃষ্ঠা-১৪। সিপাহি যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনায় বিদ্রোহী সেপাইদের সম্বন্ধে 'ধর্মান্ধ, গোঁয়ার অশিক্ষিত' ইত্যাদি কঠোর শব্দ প্রয়োগ না করলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপক প্রচলিত মনোভাব (এ মনোভাব বর্তমান শতাব্দীর প্রখ্যাত কয়েকজন ঐতিহাসিকেরও আছে) দ্বারা চালিত হ'য়ে চর্বিমিশ্রিত কার্তুজের জনরব প্রসঙ্গে লেখক ব'লেছেন, "মূর্খতা নানা অনিষ্টের প্রসূতি।" এই মনোভাব সম্বন্ধে কেবলমাত্র রামগোপাল সান্যালকে দায়ী ক'রে লাভ

নেই। ব্রিটিশ সামরিক বিভাগে পূর্ব প্রচলিত ব্রাউন বেস বন্দুকের পরিবর্তে নবপ্রবর্তিত উন্নতমানের দূরপাল্লার এনফিল্ড রাইফেল-এর কার্তুজের মোড়কে চর্বিমাখানোর জনরবটা যে নিতান্তই ভিত্তিহীন নয়, প্রখ্যাত একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিকও তা স্বীকার ক'রেছেন। এখানে প্রাসঙ্গিক হবে এই বিবেচনায় তাঁর গ্রন্থ থেকে আমি তিনটি অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :—

"But now, suddenly, a story of most terrific import found its way into circulation. It was stated that the Government had manufactured cartridges greased with animal fat, for the use of the native army ; and the statement was not a lie." [J. W. Keye, A History of the Sepoy War in India, vol I. (1875) p. 488]

* * *

"A contract of Gangadhar Banerjee & Co. with Fort William dated the 15th August, 1856 was made to supply grease and tallow for ammunition purposes". [Ibid. p. 519]

* * *

" It was true, then, that cartidges smeared with obnoxious grease had been in course of manufacture both at Fort William and Head Quarters of Artillery at Meerut. It was ture that in October, 1856, large numbers of balled cartidges had been sent up the country by steamer for the use of the Musketry Depots at Umballah and Sealkote. But it was not true that

any had been issued to Sepoy Regiments." [Ibid, p. 519-520]

ঐতিহাসিক জে, ডব্লিউ, কে সাহেব হিসেব দিয়েছেন, আম্বালায় পাঠানো হয়েছিল ২২,৫০০ এবং শিয়ালকোটে ১৪,০০০ কার্তুজ। তিনি অবশ্য বলেছেন, দেশীয় সেপাইবাহিনীকে সে কার্তুজ দেওয়া হয়নি, কিন্তু চর্বিমাখানো কার্তুজের জনরব যে ভিত্তিহীন গুজব নয়, দেখা যাচ্ছে, এ কথা তিনি স্পষ্টভাবেই স্বীকার ক'রেছেন।

(ছ) পৃষ্ঠা-৫৩। একটি বাক্য আছে, "তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত সভা হইতে তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধের ব্যয় প্রদান করা হয়।" —এটি নিঃসন্দেহে মুদ্রণ প্রমাদ। উক্ত সভা ব'লতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। কিন্তু এই বিভ্রান্তিজনক বাক্যের অন্তরালে লেখকের প্রকৃত বক্তব্য যে কী ছিল, তা অনুমান করা কঠিন।

রামগোপাল সান্যাল নিজে বহু প্রখ্যাত ব্যক্তির জীবনী লিখে রেখে গেছেন কিন্তু তাঁর জীবনী কেউ লেখেননি। এখানে তাঁর জীবন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া কর্তব্য বোধ করি। অলোক রায় সম্পাদিত রামগোপাল সান্যালের দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ Reminiscences and Anecdotes of Great men of India (1894, 1895) গ্রন্থের সম্পাদকীয় ভূমিকা থেকে লেখক-জীবনীর এই উপাদান সংগৃহীত হল।

রামগোপাল সান্যালের পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র সান্যাল। তদানীন্তন নদীয়া জেলার মেহেরপুর তাঁর জন্মস্থান। জন্মসাল এখনো সঠিকভাবে জানা যায় নি। সম্ভবত ১৮৫০ সালের অল্প কয়েকবছর আগে তাঁর জন্ম হয়। সান্যাল পরিবার কৃষ্ণনগরের গোয়াড়ি অঞ্চলে বাস ক'রতেন। প্রখ্যাত রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতা শ্রীপদ লাহিড়ীর কন্যা মনমোহিনী দেবী ছিলেন রামগোপালের

প্রথমা পত্নী। মনমোহিনী দেবীর অকালমৃত্যুর কিছুকাল পরে রামগোপাল দ্বিতীয় বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর নাম রাজুবালা দেবী। অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয়া পত্নীরও মৃত্যু হওয়ায় আর বিবাহ করেননি রামগোপাল।

এণ্ট্রান্স এবং এফ, এ পরীক্ষা পাশ করবার পর রামগোপাল কৃষ্ণনগরের এ, ভি, হাই ইংলিশ স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালের প্রখ্যাত নাট্যকার ও সঙ্গীতরচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সেই সময় তাঁর ছাত্র ছিলেন। পরে একে একে চুয়াডাঙা হাইস্কুল, কুষ্টিয়া হাইস্কুল, মামজোয়ানি হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকতার পর তিনি উড়িষ্যার সম্বলপুর হাইস্কুলে যোগদান করেন এবং সেই স্কুলেই তাঁর শিক্ষকতাবৃত্তির সমাপ্তি। যৌবনে কৃষ্ণনগরে অবস্থান কালে তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্রে মফস্বল সংবাদদাতা রূপে কাজ ক'রে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ১৮৮৩ সালের ৪মে তারিখে বৃটিশ সরকার কর্তৃক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর অবিচারের প্রতিবাদে কৃষ্ণনগর শহরে তিনিই প্রথম প্রকাশ্য জনসভার আয়োজন করেছিলেন। বৃত্তি পরিবর্তনের অল্প কিছুকালের মধ্যেই ১৮৯০ সাল অথবা তার কিছু আগে কলকাতার তালতলা অঞ্চলে একটি বাড়ি কিনে তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস ও সেই সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সাংবাদিকতার বৃত্তি অবলম্বন করেন। প্রথম কয়েকবছর তিনি বেঙ্গলী পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। তারপর ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে যোগদান করেন। এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল এক দশক কিম্বা তারও বেশী। ১৯২১ সালে রামগোপাল সান্যাল দেহত্যাগ করেন।

॥ রামগোপাল সান্যাল রচিত গ্রন্থসমূহের তালিকা ॥

বাঙলা: ১। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী (১৮৮৭)। ২। বাবু কৃষ্ণদাস পালের জীবনী (১৮৯০)

ইংরিজি : 1. The Life of the Hon'ble Kristodas Pal Bahadur C. I E (1886)

2. History of the celebrated criminal cases and resolutions recorded thereon by both Provincial Supreme Governments (1888)

3. A General biography of Bengal Celebrities both living and dead (1888)

4. Reminiscences and anecdotes of Great Men of India (1894, 1895)

দীর্ঘকাল যাবৎ রামগোপাল সান্যালের গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ হয়নি। সম্প্রতি হ'তে আরম্ভ হয়েছে। কয়েকবছর আগে 'এক্ষণ' পত্রিকায় (১৩৭৭) হরিশচন্দ্রের জীবনী মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক গ্রন্থাকারে মুদ্রণ হয়নি। 'এক্ষণ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সেই উদ্যম অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু মূল পুস্তকের সঙ্গে সেই মুদ্রণে পাঠে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। আমরা ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত মূল পুস্তকের সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে এই পুনর্মুদ্রণ সম্পন্ন করলাম। গ্রন্থরচনার প্রায় শতবর্ষ পরে আমাদের এই প্রচেষ্টার প্রধান কারণ, এই জীবনী যেন চিরকালের মতো দুষ্প্রাপ্য না হ'য়ে যায়।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের শোকসূচক তথা হরিশ-মূল্যায়নভিত্তিক দু'টি রচনা সংযোজন করা হ'ল। কিশোরীচাঁদ মিত্রের ইংরিজি রচনাটির অনুবাদ করেছিলেন প্রসিদ্ধ জীবনীলেখক মন্মথনাথ ঘোষ। কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনাটি বাঙলা ভাষাতেই লিখিত।

পরিশিষ্টে স্পষ্টভাবে একটি কথা জানিয়ে রাখা আমার নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি। হরিশের এই জীবনী পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগ, উৎসাহ, পরিকল্পনা ও পরিশ্রম সবই অনুজপ্রতিম অধ্যাপক অলোক রায়ের। কেবলমাত্র 'সংক্ষিপ্ত পরিচিতি' শীর্ষক এই ভূমিকাটুকুর দায়িত্ব আমার। অলমিতি—

নিবেদক

স্কটিশ চার্চ কলেজ
কলিকাতা ৭০০০০৬

অনিলকুমার সেনগুপ্ত

হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী।

THE LIFE OF BABU HARISH CHANDRA MUKERJEE

THE FOUNDER OF THE HINDOO PATRIOT

শ্রীরামগোপাল সান্ন্যাল প্রণীত।

কলিকাতা

৩৩নং নিউটীপুকুর ইষ্ট লেন, কলিকাতা

নবজীবন যন্ত্রে

শ্রীদিগম্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

খৃঃ ১৮৮৭।

Price 6 annas. মূল্য ।৵৹ আনা।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র

উৎসর্গ পত্র

বঙ্গসাহিত্য হিতৈষী অশেষ গুণনিধান
রাজশ্রী ভাওয়ালাধিপতি রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়
বাহাদুর করকমলেষু—

রাজন্।

আমি বহু পরিশ্রমে বঙ্গের শিরোভূষণ স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার অর্থানুকূল্যে জনসমাজে প্রচারিত করিতে সমর্থ হইলাম। আপনি বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিয়ত যত্নপর রহিয়াছেন। বঙ্গের পরম গৌরবাস্পদ ব্যক্তির জীবনী আপনারই উৎসাহে ও বদান্যতায় বঙ্গসাহিত্য সংসারে এই প্রথমে স্থানপরিগ্রহ করিল। এখন এই গ্রন্থ আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত আপনার করকমলে সমর্পণ করিলাম। যে মনস্বী পুরুষ আপনার অসাধারণ প্রতিভায় ও অপূর্ব্ব দেশহিতৈষিতায় অল্পকালের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া, গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনী যৎসামান্যভাবে লিখিত হইলেও, আশাকরি, আপনার নিকটে অনাদৃত হইবে না।

বশম্বদ

শ্রীরামগোপাল সান্ন্যাল।

২২নং নিউগীপুকুর ইষ্ট লেন,
তালতলা, কলিকাতা। অক্টোবর ১৮৮৭।

ভূমিকা

আজ প্রায় ২৭ বৎসর হইল, বঙ্গের শিরোভূষণ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনী ইংরাজীতে কিম্বা বাঙ্গালায় কেহই লিখিতে প্রয়াস পান নাই। এত দিন পরে তাঁহার জীবনী সম্যক্‌রূপে লেখা অনেক কারণে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমত হরিশের সহবর্ত্তী লোকের অনেকেরই পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। দ্বিতীয়ত হরিশের লিখিত হিন্দুপেট্রিয়ট কাগজ বা চিঠিপত্রাদি প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে তাঁহার জীবনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন। কিন্তু "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল" ইহা বিবেচনা করিয়া আমার অল্প বুদ্ধি ও ক্ষমতানুসারে যথাসাধ্য হরিশের জীবনী সঙ্কলিত করিলাম। ইহাতে যে অনেক পরিমাণে অঙ্গহীনতাদি দোষ আছে তাহা আমি স্বীকার করি, এবং ভরসা করি পাঠকগণ সে সকল ক্ষমা করিবেন। হরিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শনই এই পুস্তক প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন এই আমার প্রথম উদ্যম। ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তক লিখিবার সময় শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয়গণ আমায় অনুগ্রহ করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, [স]হৃদয় পাঠকবর্গ এই গ্রন্থ পাঠে কিয়ৎ পরিমাণে তৃপ্তিলাভ করিলেই পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

এই পুস্তক সঙ্কলিত হইবার পর ভবানীপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজলাল

চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমায় বলেন যে, ১৮৫৪ খৃঃ মধুসূদন রায় আপনার মুদ্রাযন্ত্র বিক্রয় করায়ঃ-হরিশ ভবানীপুরের সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভার এক প্রেস হইতে হিন্দু পেট্রিয়ট বাহির করেন ; এবং ১৮৫৬ খৃঃ হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস সংস্থাপন করেন।

২২ নং নিউগী পুকুর, ইষ্ট্‌লেন তালতলা,
কলিকাতা। অক্টোবর ১৮৮৭।

শ্রীরামগোপাল সান্ন্যাল।

মুখবন্ধ

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর সময়ে বঙ্গে যে সকল বালকের জন্ম হইয়াছে, তাঁহারা এখন প্রৌঢ় যুবাপুরুষ : অনেকেরই সন্তানসন্ততি হইয়াছে। যে সকল বালিকার জন্ম হইয়াছে তাঁহারা এখন সকলেই প্রৌঢ়া গৃহিণী, কাহারও কাহারও দৌহিত্র দৌহিত্রী হইয়াছে। এই কাল পরে হরিশের জীবনী প্রকাশিত হইতেছে, ইহাও আশাপ্রদ।

আমরা এখনও বালেন্টিন জামিরে ডুবাল লইয়া ব্যস্ত ; হরিশ, রামগোপাল, কেশব, দ্বারকানাথ—এ সকলের কথায় আমরা থাকি না। আমরা ঘোরতর আত্মবিস্মৃত জাতি। সোণা বাহিরে রাখিয়া শুধু আঁচলে গিরা দিতে আমাদের মত হয় ত আর কেহ নাই। তোমার যদি একটি আকব্বরি মোহর, আধুলি বা সিকি থাকে, তবে তাহাই লক্ষ্মীর হাঁড়ীতে যত্ন করিয়া রাখিও, পুষ্পচন্দনে পূজা করিও, কালে তাহাতেই তোমার লক্ষ্মী উজলা হইবেন। আর তাহাতে অযত্ন করিয়া, তাহা দূরে ফেলিয়া, লঙ্কায় রাশি রাশি সোণা আছে শুনিয়া, কেবল শুধু আঁচলে গিরা দিলে, কখন কিছু হবে না ভাই।

হিন্দুহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র সত্য সত্যই দেশভক্তির আকব্বরি মোহর। নিখাদ, খাঁটি পাকা সোণা। এই হরিশ্চন্দ্রে ভক্তি করিতে শিখিলে, সত্যসত্যই তোমার লক্ষ্মী উজলা হইবেন।

হরিশের স্বদেশভক্তি—তাঁহার প্রাণ ; সেই ভক্তিভরেই তিনি জীবিত ছিলেন ; সেই ভক্তিভরেই তাঁহার লেখনী তেজস্বিনী, ভাষা ওজস্বিনী ও তিনি স্বয়ং মনস্বী হইয়াছিলেন। সেই ভক্তির বলেই তিনি একাকী, সহস্র দুর্দ্ধর্ষ প্রবল প্রতাপান্বিত নীলকরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করিয়াছেন। সেই ভক্তিবলেই তিনি লর্ড ডালহৌসির সর্ব্বগ্রাসিনী রাক্ষসী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, আবার সেই ভক্তিবলেই হরিশ্চন্দ্র দারুণ সিপাহী বিভ্রাট সময়ে "ভারতের কোটি কোটি নিঃসহায় লোকের পক্ষ হইয়া" একাকী রাজদ্বারে অযাচিত প্রতিভূ-স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। হরিশের মত দেশভক্ত দয়ার ভিখারী না পাইলে, লর্ড কানিঙ্গের সার্ব্বজনিক দাক্ষিণ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারিত কি না সন্দেহ। এক দিকে সহস্র সহস্র দানব ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীর রক্তপিপাসায় লালায়িত হইয়া, সহস্র সহস্র লেলিহান জিহ্বা নির্গত করিয়া অনবরত 'প্রতিহিংসা' 'প্রতিহিংসা' ধ্বনিতে চীৎকার করিতেছে, অন্য দিকে এক সৌম্যমূর্ত্তি বঙ্গ ব্রাহ্মণ যুবা, অসীম দেশভক্তিভরে, সেই অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া—'রক্ষা কব' 'ক্ষমা কর' 'দয়া কর' বলিয়া কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিতেছে। বলিতেছে 'যদি ভারতে ইংরাজ রাজ্য স্থায়ী করিবে, যদি ইংরাজ আপনাকে রক্ষা করিবে, তবে ইংরাজ, ক্ষমা কর, দয়া কর ; অতীতের অত্যাচার ভুলিয়া যাও, ভবিষ্যতে ভারতে ইংরেজের প্রতাপচ্ছবি মনে কর ; ভারতের সাম্রাজ্যই ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য, সেই ভারতকে রক্ষা কর, ক্ষমা কর, দয়া কর।' ইংরাজের রাজলক্ষ্মী, ভারতভক্ত ব্রাহ্মণ যুবার কাতরোক্তি, মহা রাজনীতিকের এই স্বার্থ-পরার্থ-মিশ্রিত অপূর্ব্ব রাজনৈতিক উক্তি,—আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিলেন ; তিনি লর্ড কানিঙ্গে ভর করিয়া ভারতের সমগ্র দেশে প্রদেশে, গ্রামে নগরে, দ্বারে দ্বারে, ক্ষমা ঘোষণা করিলেন। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত ভারত হইতে বিদ্রোহ গিরিগুহায় বিদূরিত হইল ; শান্তির সুস্নিগ্ধ বায়ু ভারতে বহিতে

লাগিল; ভারতের প্রাণ ও ইংরেজের মান যুগপৎ রক্ষা পাইল। যথার্থই বলা হইয়াছে; হরিশ্চন্দ্র "লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অকালমৃত্যু হইতে, শ্মশান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই জন্য" হরিশ্চন্দ্রের ভারতহিতৈষী নামের সার্থকতা হয়।

হরিশ্চন্দ্রের ইংরেজিতে অপূর্ব্ব রচনাশক্তি, অগাধ পরিশ্রমে প্রবৃত্তি, নানা-বিষয়িণী গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইতিহাসের আলোচনা—অত্যাচারের উপর তাঁহার ভীষণ ভ্রূকুটি, রাজপুরুষগণের নিত্য নৈমিত্তিক দুষ্ক্রিয়াকলাপে নিয়ত মর্ম্মান্তিকরূপে অথচ সরসভাবে উপহাস ও বিদ্রূপ—এ সকলই হরিশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,—বড় সুললিত, বড় সৌম্য অথচ সবল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বটে, কিন্তু হরিশের প্রাণ—তাঁহার জ্বলন্ত দেশভক্তি। সেই মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত ছিল বলিয়াই, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল লাবণ্যে ঝলমল করিত, সামর্থ্যে দেবপরাক্রম ধারণ করিত।

হরিশ্চন্দ্র দেশভক্তির উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত অবতার ছিলেন; এখনকার দিনে সেই দেশভক্তি নানা মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে; আত্মভক্তি, যশোলিপ্‌সা; পদাকাঙ্ক্ষা, মানভিক্ষা, এখন কত মূর্ত্তি কত দিক হইতে দেশভক্তির অঙ্গচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিয়া অভিনয়ে বঙ্গভূমিকে রঙ্গভূমিতে পরিণত করিতেছে, এই সময়ে প্রকৃত দেশভক্তের জীবনী প্রকাশ বিশেষ সময়োপযোগী ও আশাপ্রদ: সেই জন্য আশান্বিত হৃদয়ে আমরা এই জীবনীর মুখবন্ধরূপে হরিশ্চন্দ্রের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলাম।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

হিন্দুপেট্রিয়ট হরিশ্চন্দ্র

হিন্দুপেট্রিয়টের জন্ম-বিবরণ

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে হিন্দুপেট্রিয়ট সংবাদপত্র কলিকাতা বড়বাজারের কালাকর ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রায় মহাশয়ের মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। মধুসূদন বাবু এখনও জীবিত আছেন। তিনি বলেন, প্রথমে অন্য কোন ব্যক্তির জন্য ছাপাখানার সরঞ্জাম তিনি ক্রয় করেন, পরে সেই ব্যক্তি ছাপাখানা না করাতে তিনি স্বয়ং ছাপাখানা চালাইতে ইচ্ছা করেন। এই ছাপাখানা হইতে একটি সংবাদপত্র চালাইতে তাঁহার ইচ্ছা হয়। কিন্তু নিজে সেরূপ কৃতবিদ্য ছিলেন না বলিয়া তৎকালীন কৃতবিদ্যদিগের সাহায্য পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিমলার ঘোষবংশ উজ্জ্বলকারী-খ্যাত্যাপন্ন শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ (যিনি পরে বেঙ্গলী খবরের কাগজ সংস্থাপন করেন) ও তাঁহার দুই সহোদর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ ঘোষ ও ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ প্রথমে হিন্দুপেট্রিয়ট পত্র লিখিতে আরম্ভ করেন। শ্রীনাথ বাবু তখন কলিকাতার কালেক্টারির মেঃ আরথর গ্রোট সাহেবের অধীনে হেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত ছিলেন; পরিশেষে ইনিই কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হন। ক্ষেত্র বাবু তখন কোন সওদাগরের বাটীতে চাকরী করিতেন। ইনি এখনও জীবিত আছেন। ইহাঁর বয়স এখন ৬৪ বৎসর। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহাঁর সমবয়সী ছিলেন। এই মহাত্মাগণ চাকরী করিয়া

যে সময় পাইতেন সেই অবসরকালে হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদনে ক্ষেপণ করিতেন। সংবাদপত্র লিখিয়া লাভ করিবার প্রত্যাশা তাঁহাদিগের ছিল না এবং সে প্রত্যাশা থাকিলেও তাহা সফল হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ সেই সময়ে সংবাদপত্র পাঠের রুচি এদেশে কাহারও জন্মে নাই। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের ।১। পূর্ব্বে এদেশে কৃতবিদ্যের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল এবং ঐ অল্পসংখ্যক লোক তদানীন্তন ইংরেজদিগের প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। সুতরাং এই সকল কারণে হিন্দুপেট্রিয়ট লাভজনক হয় নাই। ঘোষজ ভ্রাতারা প্রথমে যে নবানুরাগে কাগজ লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা ক্রমে তিন চারি মাস মধ্যে মন্দীভূত হইল এবং ক্রমে ক্রমে ঐ কার্য্য হইতে তাঁহারা অপসৃত হইলেন, সুতরাং হিন্দুপেট্রিয়টের সূতিকার শৈশব অবস্থায় ধ্বংস হইবার লক্ষণ হইল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় এই কাগজকে রক্ষা করিবার লোক উপস্থিত হইলেন। তিনি বঙ্গীয় সম্পাদক সমাজের নেতা বঙ্গকুলভূষণ অমর হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই মহাত্মার বাল্যজীবনীর বিবরণ নিম্নে যথালব্ধ বর্ণন করিলাম।

হরিশ্চন্দ্রের বাল্য-জীবনী

১৮২৪ খৃঃ অব্দের বৈশাখ মাসে হরিশ্চন্দ্র ভবানীপুরে রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে ফুলিয়া কুলীনবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নাম শ্রীযুক্ত রামধন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ—প্রপিতামহ।

" দেবীপ্রসাদ—পিতামহ।

শ্রীযুক্ত রামধন—পিতা।

" হরিশ্চন্দ্র।

রামধন তিনটি বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহ উত্তরপাড়ায় হয়। এই স্ত্রীর গর্ব্ভে ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা জন্মে। পুত্রগণ ;—

১। আনন্দচন্দ্র ;

২। রাজচন্দ্র ;

৩। রাজকিশোর ;

৪। কৈলাসচন্দ্র।।২।

দ্বিতীয় বিবাহ মুর্শিদাবাদের ভবানীপুরে হয় ; এই স্ত্রীর গর্ব্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে।

১। রামচন্দ্র।

২। মুক্তারাম।

শেষ স্ত্রী—হরিশের মাতা। এই স্বর্ণগর্ব্ভার নাম রুক্মিণী দেবী। ইনি কলিকাতা ভবানীপুরবাসী ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। ইহাঁর দুই সন্তান। জ্যেষ্ঠের নাম হারাণচন্দ্র, কনিষ্ঠের নাম হরিশ্চন্দ্র। এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেবল রাজকিশোর ও মুক্তারাম জীবিত আছেন। হরিশের ৬ মাস বয়ক্রমকালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। হরিশ্চন্দ্রের পিতার ও পিতামহের পূর্ব্বনিবাস মেমারির উত্তর পূর্ব্বে ৩ ক্রোশ দূর শ্রীধরপুরে ছিল।

এদেশের কুলীন সন্তানগণ চিরন্তন প্রথানুসারে মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হয়েন। হরিশ্চন্দ্র শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর ও দেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মাতুল মহাশয়দিগের ভবনে প্রতিপালিত হন। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি একজন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় মাতৃভাষা

শিক্ষা করেন এবং সাত বৎসরে জ্যেষ্ঠ হারাণের নিকট ইংরাজি শিখিতে অভ্যাস করিয়া ভবানীপুরের ইউনিয়ন স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন। হীনাবস্থা বলিয়া স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়েরা হরিশকে বিনা বেতনে পড়িতে দিতেন। পঠদ্দশায় তিনি পাঠ্যবিষয়ে বিশেষ যত্ন ও অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। পাঠের সময় শিক্ষকগণকে তিনি কখন কখন এমন কঠিন প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিতেন যে, তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সাবধান হইয়া সেই সকলের উত্তর প্রদান করিতে হইত। কিন্তু শিক্ষকগণের প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল সে শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁহার নাম ও পদ বৃদ্ধি হইলেও কখন কমে নাই। রেবরেণ্ড পিফার্ড তাঁহার একজন শিক্ষক ছিলেন। একদা বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের বাটীতে সি, পিফার্ডের (কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পিফার্ডের সন্তান) সহিত হরিশের দেখা হয়। পিফার্ডের কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি বাল্যজীবনের কথা স্মরণ করিয়া পিফার্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।।৩।

বাল্যে নির্ভীকতার পরিচয়

হরিশ বাল্যকালে বলবান্ ও সাহসী ছিলেন। একদা একটি মা তাল গোরা তাঁহাদের স্কুলের নিকট দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে এবং কোন কোন লোকের উপর উৎপাত করে। হরিশ অন্যান্য বালকগণকে সঙ্গে লইয়া অকুতোভয়ে ক্ষিপ্ত গোরাকে সেই স্থান হইতে তাড়াইয়া দেন। এ দেশের দুরদৃষ্টবশতঃ এই সকল স্থূল স্থূল

ঘটনা ব্যতীত তাঁহার পাঠ্যাবস্থার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সংগ্রহ করা সুকঠিন।

৬ কিম্বা ৭ বৎসর ইউনিয়ন স্কুলে ইংরাজি শিক্ষা করিয়া পরিবারের দুঃখ নিবারণ মানসে হরিশ্চন্দ্রকে স্কুল পরিত্যাগ করিতে হইল, এবং অর্থোপার্জ্জনের জন্যই চাকরীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইল। সহায়সম্পত্তি না থাকিলে সকল দেশে ও সকল কালেই চাকরী পাওয়া সহজ হয় না, সুতরাং হরিশ্চন্দ্র লোকের দরখাস্তাদি লিখিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহা দ্বারা পবিবারের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার সাংসারিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সম্পাদকাগ্রগণ্য "রাইজ ও রায়তে"র বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত "মুখার্জ্জিজ ম্যাগাজিন" নামক পত্রিকায় এইরূপ লিখিত আছে :—

"একদিন বর্ষাকালে আকাশ ঘনঘটায় আবৃত, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, পথে লোক বাহির হইতে পারিতেছিল না। এমন সময় হরিশ্চন্দ্রের গৃহে তণ্ডুল-কণামাত্র ছিল না। ঘরের বাহির হইয়া কোন প্রতিবেশীর বাটীতে যাইয়া পিতলের থালা সম্বলমাত্র বন্ধক দিয়া যে চাউল খরিদ করেন, তাহাও কঠিন হইল। হরিশ মনে মনে কতই দুঃখ করিতে লাগিলেন, এবং অনাহারে ক্লিষ্ট মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, হঠাৎ ঐ সময়ে তাঁহার দ্বারদেশে একটি সম্ভ্রান্ত জমীদারের মোক্তার উপস্থিত হইলেন। মোক্তার বাবু কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। হরিশকে তিনি ঐ সকল কাগজ ইংরাজিতে অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং

পুরস্কার স্বরূপ ২ টাকা প্রদান করিলেন। হরিশ এই দুই টাকা দুই স্বর্ণ-মুদ্রা জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া আহার্য্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সে দিনের অন্নকষ্ট নিবারণ করিলেন।" এই গল্প শম্ভু বাবু হরিশের মুখে স্বয়ং শুনিয়াছিলেন। ।৪।

ইহার পর তিনি টলা কোম্পানির আফিসে ১০ টাকা বেতনে বিল লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। টলা কোম্পানিরা নীলামদার ছিলেন। তাঁহাদিগের আফিস এখনকার করেন্সী আফিসের নিকট সংস্থাপিত ছিল। এই অল্প বেতনে টলা কোম্পানির নিকট কিছুদিন কর্ম্ম করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ নিবারণে অসমর্থ হইয়া তিনি বেতনবৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সে আবেদন অগ্রাহ্য করিলে,তিনি ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। টলা কোম্পানির কার্য্যে ঘুষ লইয়া তিনি বেতন অপেক্ষা অনেক উপার্জ্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু হরিশ অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জনে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। সুতরাং যখন বেতনবৃদ্ধির উপায় রহিল না, তখন তাঁহাকে অগত্যা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইল।

এই কর্ম্ম পরিত্যাগের পর তাঁহার ভাগ্যচক্রের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল। ১৮৪৭ খৃঃ সৈনিক ব্যয়ের অডিটরের আফিসে একটি ২৫ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি খালি হয়। উক্ত কর্ম্মপ্রার্থীদিগের পরীক্ষা হয়। হরিশ্চন্দ্র সেই পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রধান হওয়ায় তিনি সেই চাকরী প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ঐ আফিসে কর্ণেল চ্যাম্পনিজ ডিপুটী অডিটার জেনরেল ও কর্ণেল গোল্ডী অডিটার জেনরেল ছিলেন। ইঁহারা হরিশের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ক্রমে ২৫ হইতে ৫০ ও ৫০ হইতে ১০০ টাকা বেতনের কর্ম্মে নিযুক্ত

করেন। পরিশেষে হরিশ্চন্দ্র ৪০০ টাকা বেতনে সহকারী অডিটারের পদে নিযুক্ত হন। এই কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত কাজকর্ম্ম করিতেন যে তাঁহার আফিসের বড় বড় সাহেবেরা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। কর্ণেল চ্যাম্পনিজ তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কর্ণেল গোল্ডী তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ আফিসে ১০০ টাকা বেতনের চাকরী প্রায়ই ইংরাজ ও ফিরিঙ্গিদিগকে দেওয়া হইত। হরিশের গুণপনা দেখিয়া তাঁহারা ২০০ টাকা বেতনের চাকরী হরিশকে প্রদান করেন এবং পরে ৪০০ টাকা বেতনে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন।

কর্ণেল চ্যাম্পনিজের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ছিল। একদা পণ্ডিত শম্ভুনাথের বাটীতে হরিশ কতিপয় বন্ধুগণসহ আইন পর্য্যালোচনায় কালাতিপাত করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার বন্ধুগণ হরিশের আইনজ্ঞানে পারদর্শিতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে কেরাণীগিরি ছাড়িয়া উকীলের ।৫। ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বলেন। তিনি তদুত্তরে বলেন যে, "কেরাণীগিরি" করিয়া তাঁহার অনেক সময় থাকে এবং সেই সময়মধ্যে দরিদ্র লোকদিগের জন্য দরখাস্ত লেখা ও সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা যায়। আর তিনি বন্ধুদিগকে বলেন যে, কর্ণেল চ্যাম্পনিজ তাঁহার দুরবস্থায় এত উপকার করিয়াছেন যে, তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না। সেই সময়ে হরিশ কৃতজ্ঞতায় উদ্দীপ্ত হইয়া কর্ণেল চ্যাম্পনিজের নানা প্রশংসা করিয়াছিলেন।

হরিশের সমকালবর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে কেবল সিমলার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ ও আর দুই একটি ছাড়া অন্য কেহ এখন জীবিত নাই। ক্ষেত্র বাবু মিলিটারি আফিসে কর্ম্ম করিতেন। তিনি আমাদিগকে বলেন যে, হরিশ কখন অতি সামান্য কর্ম্মচারীকেও অসম্মানসূচক কথা বলেন নাই। তাঁহার শরীরে রাগ ছিল না। যিনি নিজের সম্মানের প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখেন, তিনি অন্য ব্যক্তির প্রতি কখনও অসম্মান করিতে পারেন না; হরিশ এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। অতি সামান্য কর্ম্মচারী তাঁহাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আহ্লাদের সহিত সকল কথা বলিয়া দিতেন।

ক্ষেত্র বাবু বলেন একদা আর, এইচ, হলিংবেরী (ঐ আফিসের রেজিষ্ট্রার) হরিশের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ইংরাজিতে (look at the man) অর্থাৎ "মিন্‌সের রকম দেখ" এই কথা প্রয়োগ করেন। হরিশ সেই সময়ে ইহার কোন উত্তর না দিয়া পরে কর্ণেল চ্যাম্পনিজের কাছে আপনার কর্ম্ম পরিত্যাগপত্র পাঠাইয়া দেন। কর্ণেল হরিশকে নানাপ্রকার বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া বলেন যে, তুমি কাগজপত্র কর্ণেল রামজের নিকট না পাঠাইয়া আমার নিকট পাঠাইবে। কর্ণেল চাম্পনিজ অনুসন্ধানে পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন যে, হলিংবেরী তাঁহাকে অসম্মানের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি যেন হলিংবেরী এই দোষে দোষী, ইহা জানিতে না পারিয়া রামজে সাহেবকে উল্লেখ করিয়া হরিশের রাগ ক্ষান্ত করিলেন। হরিশকে আফিসের সাহেবরা সকলেই সম্মান করিতেন এবং জানিতেন এই স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মণ অপমান সহ্য করিবার লোক নহে। ।৬।

হরিশ্চন্দ্রের সত্যপ্রিয়তা

ক্ষেত্র বাবু, এই বিষয়ে নিম্নলিখিত গল্প আমাদিগকে বলেন।

একদা ক্ষেত্র বাবু ও তাঁহার ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও হরিশ উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে কোন বিষয় উপলক্ষে গমন করেন। বিষয়কার্য্য শেষ হইলে তাঁহারা বেলুড় হইতে কাশীপুরে আসিবার জন্য গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। ঘাটে একজন মাঝি ছিল। সে যো বুঝিয়া পার করিতে ১ টাকা চাহিল। ক্ষেত্র বাবু মাঝিকে পার হওয়ার বড় গরজ নাই ইহা দেখাইবার জন্য হরিশকে বলিলেন যে "তবে চল, আমরা যাইয়া, সালকের ঘাটে পার হই।" হরিশ জানিতেন যে, তাঁহাদের কাশীপুরে নিশ্চয়ই যাইতে হইবে। তিনি ক্ষেত্র বাবুকে বলিলেন দরিদ্র মাঝিকে মিথ্যা কথা বলিয়া তাহার পারানির ভাড়া কমান উচিত নহে। ক্ষেত্র বাবুকে অগত্যা হরিশের অনুরোধে সেই নৌকায় পার হইতে হইল। গঙ্গা পার হইয়া হরিশ আপনার পকেট হইতে ১ টাকা বাহির করিয়া মাঝিকে দিলেন। ক্ষেত্র বাবু ইহাতে হরিশকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি আমার কাজে আসিয়াছেন, আপনার ভাড়া দেওয়া উচিত নহে।" হরিশ হাস্য করিয়া বলিলেন, তাহাতে দোষ নাই। যখন আমার কথার জন্য মাঝিকে ।০ আনার স্থানে ১ টাকা দিতে হইল, তখন এ টাকা আমার দেওয়া উচিত।

গঙ্গা পার হইবার সময় বায়ু প্রবলবেগে বহিতেছিল। ক্ষেত্র বাবু নৌকা আন্দোলিত হইলে ভয়ে ঈশ্বরের নাম করিতে লাগিলেন। হরিশ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

হরিশের নিজ চেষ্টায় জ্ঞানোন্নতি

হরিশ্চন্দ্র স্কুলে অতি অল্পদিন লেখাপড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অন্যান্য লোকের ন্যায় চাকরী পাইয়া আলস্য ও ব্যসনে সময় ও ধন ব্যয় করেন নাই। আমাদের দেশের লোকেরা চাকরী পাইলে সচরাচর লেখাপড়ার চর্চ্চা পরিত্যাগ করেন, কিন্তু হরিশ তাহা করেন নাই। ।৭। বাল্যকালে অবস্থার হীনতাহেতু ভাল করিয়া লেখাপড়া করিতে পারেন নাই। এখন একটি কর্ম্ম পাইয়া অবস্থার কিছু সচ্ছলতা হওয়াতে তিনি কলিকাতা লাইব্রেরীতে (মেটকাফ্ হলে) প্রতিদিন আফিসের কার্য্য সমাপনান্তে নিয়মিত রূপে পুস্তকাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। ঐ পুস্তকালয়ে ২ টাকা মাসিক চাঁদা দিতে হইত। হরিশ তখন যে অল্প বেতন পাইতেন, তাহা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া এই চাঁদার টাকা দিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়-ভ্রাতা রাজকিশোর বাবু বলেন যে, হরিশ ৫ মাসের মধ্যে ৭৫ বলুম এডিনবরা রিভিউ পাঠ করেন। অনরেবল রাজা প্যারীমোহন একদা হরিশকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে এডিনবরা রিভিউ তিনি ৩।৪ বার ভাল করিয়া পড়িয়াছেন। হরিশ দরিদ্রতা বশতঃ ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্কুল পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লেখাপড়ার চর্চ্চার স্পৃহা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মিলিটারি অডিটর জেনরেলের আফিসে কর্ম্ম করিয়া যে সময় থাকিত সেই সময় তিনি কলিকাতা লাইব্রেরী হইতে পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। কর্ণেল চ্যাম্পানিজ ও কলিকাতার তদানীন্তন ইন্‌কম ট্যাক্সের কমিসনার তাঁহাকে ভাল ভাল পুস্তক পাঠ করিতে দিতেন। হরিশ এই সকল পুস্তক নিয়ত বিশেষ

মনোযোগের সহিত পড়িতেন। এই সময়ে মিসনারি অগ্রগণ্য মহাত্মা ডাক্তার ডফ্ সাহেব কলিকাতায় মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। হরিশ আফিসের পর ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া নিমতলা ষ্ট্রীটে আসিয়া সেই সকল বক্তৃতা শুনিতেন। হরিশের শরীরে বিশেষ বল ছিল। তিনি সেই কারণে অনেক পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হইতেন না। তিনি দেখিতে দোহারা, ঈষৎ গৌরবর্ণ, লম্বাকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার চক্ষুর বড় শোভা ছিল। আইন তিনি ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন। শম্ভুনাথের বাটীতে এক সভা ছিল, সেই সভায় হরিশ আশ্চর্য্যরূপে আইনের পর্য্যালোচনা করিতেন। রাইজ এবং রায়তের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন যে, হরিশ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সমকক্ষ হইবেন বলিয়া বিশেষ যত্নের সহিত আইন শিক্ষা করেন। শ্রদ্ধাস্পদ প্রসন্নকুমার প্রথমে হরিশের কথায় মনোযোগ দিতেন না, কিন্তু কালক্রমে হরিশের আইন বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিলে হরিশের কথা আদরে শুনিতেন।।৮।

হরিশের বিবাহ

পিতামাতার অনুরোধে হরিশকে অল্প বয়সে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রথমে বালী উত্তরপাড়ার গোবিন্দচন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদা দেবীকে বিবাহ করেন। হরিশের ১৬ বৎসর বয়সের সময় তাহার এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র তিন বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হয় এবং ইহার পর তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ইহার কিছুদিন

পরে তাঁহার মাতা ও মাতুলের অনুরোধে তিনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন।

হরিশের সম্পাদকীয় কার্য্য

মনুষ্য অবস্থার দাস, এ কথা যদিও স্বতঃসিদ্ধ, তথাপি মহান্ পুরুষেরা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে কঠোর অবস্থার স্রোতকে পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক জগতের কল্যাণকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিশাল বিঘ্ন বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া পরিশেষে কৃতকার্য্য ও অশেষ যশোভাগী হয়েন। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পৃথিবীর ইতিহাসে লিখিত আছে। হরিশের জীবনী এই সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্থল। হরিশ যদিও পরের চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি নিজ ক্ষমতাবলে হিন্দুপেট্রিয়ট কাগজের সম্পাদক হইয়া অভূতপূর্ব্ব কার্য্য সম্পন্ন করেন। এ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত রাজা রামমোহন রায় করেন এবং তাহার পরে স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ ও অন্যান্য কৃতবিদ্যগণ সেই আন্দোলনের বিশেষ পরিপুষ্টি সাধনে যথাসাধ্য যত্নবান হয়েন। হরিশ নিজ ক্ষমতায় সেই আন্দোলনকে এক পাশ্চাত্য শক্তিতে বলীয়ান করেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই সে ক্ষমতায় ক্ষমতাবান ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় রাজনীতিক বিষয় লিখিবার ক্ষমতা আজ পর্য্যন্ত বঙ্গে কাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কি এদেশীয় কি বিদেশীয় সকল লোকেই ইহা এক্ষণে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেন। এই জন্যই হরিশকে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর শীর্ষস্থানীয় বলে।

কেরাণীগিরি করিয়া, ইংরাজের ভৃত্য হইয়া এই আন্দোলনের অধিনায়ক হওয়া এখনকার কালে বড় সহজ নহে। হরিশের সময়ে যাহা সম্ভবপর ছিল, তাহা এখন অসম্ভব হইয়াছে। সে কেবল সময়ের গতির।৯। উপর নির্ভর করে। হরিশের সময় অনুকূল ছিল। সে সময়ের সাহেবেরা উদার, মহান্ ও বিদ্যার উৎসাহী ছিলেন। রাজকর্ম্মচারীরাও দেশীয় লোকদিগের মুখে দেশের অবস্থা জানিতে চাইতেন। বিদ্বান লোকের সংখ্যা কম ছিল বলিয়া, হরিশের ন্যায় বিদ্বান লোককে সকলেই যথেষ্ট সমাদর ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। হরিশ এইজন্য রাজকর্ম্মচারী হইয়াও রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন বাধা প্রাপ্ত হন নাই। রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে নানা প্রকারে উৎসাহ প্রদান করিতেন। কিন্তু আজ সে সময় নাই। এখন রাজনৈতিক আন্দোলন অনেক রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে চক্ষুশূল হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান অবজারভার কাগজ যে অবস্থায় উঠিয়া গিয়াছিল, তাহা পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল লব সাহেব একদা বেঙ্গলী খবরের কাগজে "ব্রিটিশ রাজ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল তখন বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরূঢ়। তিনি লব সাহেবকে রাজকর্ম্মচারী বলিয়া এইরূপ প্রবন্ধ লিখিতে নিষেধ করেন। কাজে কাজেই লবের লেখা বন্ধ হইল। ইণ্ডিয়ান অবজারভার কাগজে যে সকল লোক লিখিতেন, তলায় তলায় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন এজন্য ঐ কাগজ বন্ধ হইল। এখন কোন বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী খবরের কাগজে লিখিলে তাঁহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বাহির

করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু হরিশের সময় এরূপ ছিল না। তিনি রাজকর্ম্মচারী হইয়াও যেরূপে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের দোষ গুণ বলিতেন এখন তাহা বলা একজন কেরাণীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। সেইজন্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হরিশের সময় সানুকূল ছিল।

হরিশ কিরূপে এই ক্ষমতা উপার্জ্জন করিলেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

হরিশ অল্প বয়স হইতেই খবরের কাগজ পড়িতে এবং উহাতে লিখিতে ভালবাসিতেন। হিন্দুপেট্রিয়ট গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি সমকালবর্ত্তী ইংরাজী কাগজে লিখিতে আরম্ভ করেন। ফিনিক্স, হরকরা, (যাহা এখন ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের সহিত সংলিপ্ত হইয়াছে) এবং মেঃ কব হরি নামক প্রসিদ্ধ সম্পাদকের অধীনস্থ ইংলিশম্যান কাগজে তিনি প্রথমে নানা প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। বঙ্গের যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি প্রথমে ইংরাজীতে ।১০। খবরের কাগজ চালাইতে লাগিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ সর্ব্বপ্রধান। ইহাঁর একখানি খবরের কাগজ ছিল, তাহার নাম হিন্দু ইন্‌টেলিজেনসার। হরিশ এই কাগজেও লিখিতেন। ১৮৪৯ সালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর জমীদারেরা বেঙ্গল রেকর্ডার নামক এক সংবাদপত্র চালান, হরিশ এই কাগজে লিখিতে থাকেন।

১৮৫৩ সালে হিন্দুপেট্রিয়ট সংস্থাপিত হইলে হরিশ উহা একাকী লিখিবার ভার গ্রহণ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঘোষজা মহাশয়েরা এই কার্য্য হইতে ক্রমে ক্রমে অপসৃত হইয়াছিলেন।

দেশের অবস্থা তখন এত শোচনীয় ছিল এবং সাধারণ শিক্ষার অভাব এত ছিল যে, খবরের কাগজের মর্য্যাদা কেহই বুঝিত না।

তৎকালীয় ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা ও অন্যান্য ইংরাজ সম্প্রদায় এদেশীয় লোকের লিখিত কাগজ পড়িতে অনিচ্ছুক ছিলেন। জমীদার ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অরুচি ছিল, কৃতবিদ্যের সংখ্যা অঙ্গুলি রেখাতেই গণনা করা যাইত, সুতরাং সংবাদপত্র চালান কেবল বিড়ম্বনার কার্য্যমাত্র ছিল। লাভ করা দূরে থাকুক "ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইলেও" তাহার উপকারিতা লোকে বুঝিতে পারিত না। এই অবস্থায় হরিশ হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়া কেবল দেশানুরাগে প্রণোদিত হইয়া উক্ত কাগজ চালাইতে লাগিলেন। তিনি তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এই হিন্দুপেট্রিয়ট সিপাহী বিদ্রোহের সময় লর্ড ক্যানিঙের কর্ণধার স্বরূপ হইবে। পার্লামেণ্ট সভায় পঠিত হইবে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মুখপাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিবে।

পূর্ব্বোক্ত শোচনীয় অবস্থায় হিন্দুপেট্রিয়ট চলিতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্র বিনা পারিশ্রমিকে প্রতি সপ্তাহে রাত্রি জাগরণ করিয়া কাগজ লিখিতে লাগিলেন। গ্রাহকের সংখ্যা অতি কম ছিল। ১০০ কিম্বা ১৫০ গ্রাহক ছিল কি না সন্দেহ। সেই সময়ে খবরের কাগজের মাসুল প্রতি সপ্তাহে ৵০ আনা করিয়া লাগিত, এবং ইহার অগ্রিম দেয় মূল্য ১০ টাকা। এই অবস্থায় হিন্দুপেট্রিয়ট কয় বৎসর চলিল, পরে উহার মালিক বাবু মধুসূদন রায় এই ভূতের বোঝা বহিতে অনিচ্ছুক হইলেন, এবং সেই সময়ে তিনি পীড়িত হইলে হিন্দুপেট্রিয়ট বিক্রয় করিবার ইচ্ছা করিলেন। হরিশ মধু বাবুর নিকট হইতে বহুকষ্টে হিন্দুপেট্রিয়ট খরিদ করিলেন। হিন্দুপেট্রিয়ট ক্রয় করিয়া ।১১। জ্যেষ্ঠ হারাণ বাবুকে

উহার ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। হিন্দুপেট্রিয়ট তখন প্রতি বৃহস্পতিবারে ভবানীপুর হইতে বাহির হইতে লাগিল। ভবানীপুরের সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইলেন। হিন্দুপেট্রিয়ট দেশের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হইল বটে, কিন্তু উহার আয় হইতে কিছুতেই ব্যয় পোষাইত না। হরিশ পরের সাহায্য লইয়া কাগজ চালাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। তিনি বলিতেন, কাগজের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে, পরপ্রত্যাশী হওয়া ভাল নয়। সে সময়ের প্রসিদ্ধ জমীদার পাইক পাড়ার রাজা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বড় দেশহিতৈষী ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি হিন্দুপেট্রিয়টের দুরবস্থা দেখিয়া অর্থসাহায্য করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু হরিশ অর্থলোভে লোভী হইবার লোক ছিলেন না। হিন্দুট্রিয়টের ছাপা দিন দিন খারাপ হইত লাগিল। অক্ষর পুরাতন হওয়ায় ইহার ছাপা ভাল হইত না, এবং হিন্দুপেট্রিয়ট সময়ে সময়ে বিকৃতভাবে খারাপ কাগজে ছাপা হইতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্র আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিবার লোক ছিলেন না। পাছে পরের ধন লইলে দাতার মনোমত কথা হিন্দু-পেট্রিয়টে লিখিতে হয় এই ভয়ে অর্থ সাহায্য লইতে পরাঙ্মুখ রহিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচেতা সম্পাদক বড় বিরল। লোকের মুখাপেক্ষা করিয়া কিংবা দেশের কুরুচির প্রশ্রয় দিয়া অর্থলোভের ইচ্ছা আদৌ তাঁহার ছিল না। আত্মসম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের যাহাতে প্রকৃত হিত হয়, তাহাই তিনি কাগজে লিখিতেন। স্বাবলম্বন তাঁহার জীবনের প্রধান মন্ত্র ছিল। এই নিয়মে হিন্দুপেট্রিয়ট কিছু দিন চলিল, পরে উহার অক্ষর বড় খারাপ হইলে রাজা প্রতাপ-

চন্দ্র নূতন টাইপ খরিদ করিয়া দেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ হরিশের লিখিত হিন্দুপেট্রিয়ট এখন আর কোন স্থানে পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনে কিংবা মেটকাফ্ হলে ১৮৫৩ হইতে ১৮৫৬ পর্য্যন্ত এই চারি সালের হিন্দুপেট্রিয়ট রাখা হয় নাই। সুতরাং এই সময়ে তিনি কিরূপে কোন কোন বিষয়ে ঐ কাগজ লিখিয়াছিলেন, তাহা জানা অত্যন্ত কঠিন। ১৮৫৪ সালে হিন্দুপেট্রিয়টে "হিন্দু ও ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনা" এই সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপরিপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিত হয়। ইহাতে হরিশ এত পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন যে, তৎকালীন ইংরাজ সম্পাদকগণ এই প্রবন্ধের উচিত উত্তরদানে।১২। অসমর্থ হইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে ইউরোপীয় সভ্যতার যে সকল দোষ আছে তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করা হয় এবং হিন্দুদিগকে যে অৰ্দ্ধ সভ্য বলিয়া সময়ে সময়ে সাহেবেরা গালি দিতেন তাহার উত্তর প্রদান করা হয়। আর একবার তিনি বাঙ্গালীর "ধর্ম্মঘট" ও ইংরাজ মজুরদিগের চক্রান্ত প্রণালী (যাহাকে ইংরাজীতে Strikes বলে) তৎসম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে তাঁহার পাশ্চাত্য ও এ প্রদেশীয় সমাজনীতির সম্বন্ধে যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হয়।

এই সময়ে লর্ড ডালহৌসী ভারতের গবর্ণর জেনরেল ছিলেন। ইনি ১৮৫৬ খৃঃ অযোধ্যা রাজ্য খাস করিয়া লয়েন। জেনরেল আউটরাম তখন লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্ট ছিলেন। রাজা ওয়াজিদ আলিকে মেটেবুরুজে ১২ লক্ষ টাকা বার্ষিক পেন্‌সন দিয়া রাখা হইল। অত্যাচারী দেশীয় রাজার অধীনে থাকার অপেক্ষা ইংরাজ-

শাসনে প্রজার বেশী সুখ হইবে এই ধুয়া তুলিয়া, গবর্ণর জেনরেল ঐ বৃহৎ রাজ্য খাস করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ১৮৪৯ সালে সেতারার রাজা অপত্যশূন্য হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাহার মৃত্যুকালীন দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার উইল রদ করিয়া ঐ রাজ্য ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। ১৮৫৩ সালে ঝান্সী রাজ্য ও তৎপরে নাগপুর খাস ঐরূপে করা হইল। হরিশ হিন্দুপেট্রিয়টে এই সকল কার্য্যের দোষ দর্শাইয়া লর্ড ডালহৌসীর শাসন প্রণালীর অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ের হিন্দুপেট্রিয়ট এখন আর পাওয়া যায় না বলিয়া এ সকল বিষয়ে আমাদের বেশী বলিবার উপায় নাই।

সিপাহী যুদ্ধ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ব্রিটিশ রাজ্যের শান্তিপূর্ণ কুশলময় আকাশে হঠাৎ এক খণ্ড মেঘ উঠিল। ঐ মেঘ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া যে ঘোর অনিষ্ট উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহা পাঠকগণ জানেন। ১০ই মে রবিবার অপরাহ্ণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মিরট নামক স্থানে সিপাহীগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধ উপস্থিত করিল। মিরট হইতে দিল্লী, দিল্লী হইতে লক্ষ্ণৌ এবং পরে অন্যান্য স্থানে যুদ্ধানল প্রবলরূপে প্রজ্জলিত হইল। সহস্র সহস্র হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীগণ ইহাতে যোগ দিল। ইহারা পূর্ব্বেই নানা ।১৩। কারণে ইংরাজ শাসনের উপর বিরক্ত হইয়াছিল। লর্ড ডালহৌসীর রাজ্যশাসন কালে অযোধ্যা, সেতারা, ঝান্সী, নাগপুর প্রভৃতির দেশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত স্থানসকল খাস করাতে উত্তর

পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ভীত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। পরে এই অসন্তোষ অন্যান্য কারণে দৃঢ়ীভূত হইল।

সৈনিক দলে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর সম্মানের পদ লোকের পাওয়া অসম্ভব হইল। অন্যান্য চাকরীও পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিল। এই সিপাহীগণের বলে ব্রিটিশ সিংহ পঞ্জাবকেশরী রণজিত সিংহের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তাহাদের এ অভিমান থাকিলেও পূর্ব্বের ন্যায় আর সম্মান পাইত না। অযোধ্যার সিপাহী অনেকেই নিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন। এমন সময়ে এক জনরব উঠিল যে, চর্ব্বিবিশিষ্ট টোটা তাহাদিগকে ব্যবহার করিতে হইবেক। সে চর্ব্বি, যে সে চর্ব্বি নহে, ইহা গোরু ও শূকরের চর্ব্বি। সুতরাং মুসলমান ও হিন্দু উভয় দলেই ভাবিল যে, ইংরাজেরা প্রকারান্তরে তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মূর্খতা নানা অনিষ্টের প্রসূতি। কাজে কাজেই তাহারা না বুঝিয়া পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখায় লম্ফ প্রদান করে, সেইরূপ ইংরাজ রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। যেখানে ইংরাজ দেখিল, সেই স্থানে তাহার প্রাণ হত্যা করিল, ক্রমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল শ্মশানতুল্য হইল। ইংরাজরা বৈরনির্যাতনে ত্রুটি করিলেন না। পরস্পরের অত্যাচারে দেশ এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল। গৃহদাহ, স্ত্রীহত্যা, অসহায় বালক বালিকা হত্যা, নগরলুণ্ঠন প্রতিদিন ঘটিতে লাগিল। অত্যাচার করিলে অত্যাচার করিতে হয়, ইহা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এ স্বভাব সভ্যতা ও অসভ্যতার তারতম্য ভেদে বেশী কমি হইতে পারে বটে কিন্তু সিপাহী যুদ্ধে সভ্য ইংরাজ যে অসভ্য হিন্দুস্থানীর অপেক্ষা কম অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে প্রমাণ হয় না।

এইরূপে দেশের যে কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা এ স্থানে অসম্ভব। এই সঙ্কটপরিপূর্ণ অবস্থায় হরিশ্চন্দ্র যে এ দেশীয়দিগের কি উপকার করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বর্ণনা করিব। এ দেশের সাহেবেরা যে, কিরূপ ভীত হইয়াছিলেন, তাহা সংবাদপত্র পাঠে জানা যায়। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া নামক খবরের কাগজে লিখিত আছে যে, যখন সিপাহী যুদ্ধের সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিল, তখন অনেক সাহেবের মেয়েরা।১৪। ভয়ে গঙ্গার উপরে জাহাজে গিয়া রহিলেন। সকল সাহেবের পকেট কিংবা হাতে সর্ব্বদা পিস্তল ও বন্দুক থাকিত। বন্দুক না লইয়া কেহ ঘরের বাহির হইত না। সকলেই ভয়ে অস্থির। শঙ্কা উপস্থিত হইলে শঙ্কার কারণ নিবারণে মনুষ্য ব্যস্ত হয়। সুতরাং ইংরাজেরা এক বাক্যে বলিতে লাগিলেন যে, কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের দেশীয় লোকদিগের নিকট অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হউক। মুসলমানগণের মহরম পর্ব্ব সন্নিকট হইলে ইংরাজদিগের আতঙ্ক অধিকতর বৃদ্ধি হইল। কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের সেসনের কার্য্য শেষ হইলে কলিকাতার গ্রাণ্ড জুরীর প্রধান সাহেব (Foreman) জে, এইচ, ফর্গুসন সাহেব আদালতকে অনুরোধ করিলেন যে তাঁহাদের একটি প্রস্তাব বড়লাট সাহেবের কাছে পাঠাইতে হইবে। সুপ্রীম কোর্টে যে সকল অপরাধের বিচার হইত, যদি জুরী দেখিতেন যে, সেই অপরাধে সমাজের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে উহার প্রতিবিধান জন্য গবর্ণর জেনরেলের নিকটে কোনরূপ প্রস্তাব করিবার উক্ত জুরীর অধিকার ছিল। ইহাকেই ইংরাজীতে power of presentment বলে। এই ক্ষমতানুসারে তাঁহারা

প্রস্তাব করিলেন যে আগামী মহরমে তাঁহাদের জীবনের আশঙ্কা অধিক বোধে তাঁহারা লাট সাহেবকে অনুরোধ করিতেছেন যে, কলিকাতার সমস্ত দেশীয় লোকের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হউক, এবং অস্ত্র রাখিবার বিষয়ে আইন বিধিবদ্ধ করা হউক। মহাত্মা হরিশ এ সম্বন্ধে এই আপত্তি করিলেন যে, গ্রাণ্ড জুরীর উক্ত রূপ ক্ষমতা থাকিলেও তাঁহারা ঐ ক্ষমতানুসারে এতদ্দেশীয়দিগের অস্ত্র কাড়িয়া লইবার ও অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করিবার সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব করিতে পারেন না। গ্রাণ্ড জুরী উপস্থিত স্থলে আপনাদের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছেন। লাট সাহেব ও তাঁহার সদস্যগণ গ্রাণ্ড জুরীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। এই সময়ে লাট সাহেবের সভায় জে, ডোরিন, বার্ণিজ পীকক (যিনি পরে হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস হইয়াছিলেন,) এবং জে, লো সাহেব সদস্য ছিলেন। ইহাতে সাহেবেরা লাট সাহেবের উপর অনেক অসন্তুষ্ট হইলেন।

খবরের কাগজ ইংরাজদিগের বড় আদরের বস্তু। ইহার আদর ও ক্ষমতা বিলাতে এত বেশী যে ইহাকে রাজ্যের চতুর্থাঙ্গ বলে। কোন সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, কিংবা কোন ।১৫। আইন বিধিবদ্ধ বা রদ্ করিতে হইলে, দেশের রুচির পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, দেশের আচার ব্যবহার ধর্ম্মপ্রণালী পরিবর্ত্তন বা উন্নতি-সাধন করিতে হইলে সংবাদপত্রে জনসাধারণের মত প্রতিবিম্বিত হয়, এবং তদ্দারা শাসনকর্ত্তাদিগের মত পরিচালিত হয়। আমাদের দেশের অবস্থা শাসনকর্ত্তারা অনেক সময়ে জানিতে পারেন না। এমন অবস্থায় আমাদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার

ও অবিচার করা হইয়াছিল, তাহা শাসনকর্ত্তাদিগকে না জানাইলে হয়ত দেশের বহুপ্রকারে ক্ষতি হইত। সাহেবেরা এই ঘোর বিপত্তির সময়ে দলবদ্ধ হইয়া আপনাদের কাগজে বিদ্রোহীদিগের অত্যাচার কাহিনী প্রকাশিত করিতে লাগিল, এবং বৈরনির্যাতনের বিবিধ উপায় অবলম্বন মানসে গবর্ণমেণ্টকে দয়াধর্ম্মশূন্য হইতে বলিল। এই সময়ে হরিশ একাকী এই সকল লোকের কল্পিত মিথ্যা বাক্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এখনকার মত সে সময়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালী কাগজের ছড়াছড়ি ছিল না, তখন কৃষ্ণদাস ও শম্ভু শিক্ষানভিসী করিতেছিলেন, নরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ও শিশির বালক, কাজে কাজেই দেশের পক্ষ হইয়া দুইটা কথা বলে এমন লোক অধিক ছিল না। এমন অবস্থায় হরিশ যে এদেশের কি উপকার করিয়াছিলেন তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। লর্ড ক্যানিং ও তাঁহার সদস্যগণ হরিশের লিখিত প্রস্তাব সকল পাঠ করিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলেন। কাগজে বেশী চীৎকার না করিতে পারিলে কোন বিষয়েই জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সাহেব ও ফিরিঙ্গিগণ দলবদ্ধ হইয়া—দিন দিন নূতন বিষয়ে দেশীয়দিগের স্বত্বাধিকার লোপ করিবার মানসে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের পক্ষ হইয়া বড় বড় খবরের কাগজ সকল হুহুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ইংলিশম্যান, ফিনিক্স, হরকরা এক বাক্যে ইংরাজ পক্ষ হইয়া এতদ্দেশীয়দিগের উপর কোন সৎবিচার ও ক্ষমা প্রদর্শন না করা হয়, এতদ্বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইল। সে সময়ে এদেশের পক্ষ হইয়া দুইটা কথা বলে, এমন লোক ছিল না। হরিশ একাকী হিন্দুপেট্রিয়টে স্বদেশের অহিতকর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে

জোর কলমে লিখিতে লাগিলেন। যখন ইংরাজেরা কলিকাতার অধিবাসীদিগকে নিরস্ত্র করিতে পরামর্শ দিলেন তখন হরিশ্চন্দ্র দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া ইহার অমূলকতা দেখাইয়া দেন। লর্ড ক্যানিং তখন আমাদের দেশের বড়লাট, ও সেসিল বিডন ।১৬। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ছিলেন। ইঁহারা হরিশকে শ্রদ্ধা করিতেন। হরিশ লর্ড ক্যানিঙের কার্য্যপ্রণালীর পোষকতা করিতে লাগিলেন।

লর্ড ক্যানিং নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়া এদেশীয়দিগের ধর্ম্মে গবর্ণমেণ্ট কখনই হস্তক্ষেপ করেন নাই ও করিবেন না ইহা বলিয়া লোকদিগকে আশ্বস্ত করেন।

নং ৯৫২।

হোম ডিপার্টমেণ্ট ১৬ই মে ১৮৫৭।

লাট সাহেবের ঘোষণাপত্র

লাট সাহেব মন্ত্রিসভার সদস্যগণসহ দেশীয় সৈন্যগণকে সতর্ক করিতেছেন যে কোন কোন রেজিমেণ্টের লোকেরা এইরূপ রটাইয়া দিয়া লোকের মনে সন্দেহ উৎপন্ন করিয়াছে, যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ধর্ম্ম ও জাতি নষ্ট করিতে মানস করিয়াছেন। ইহা অলীক ও মিথ্যা কথা।

লাট সাহেব ও সদস্যগণ জানিয়াছেন যে, এই সন্দেহ, কুঅভিসন্ধি-বিশিষ্ট দুষ্ট লোকেরা কেবল সৈন্যমধ্যে নহে জনসাধারণ মধ্যেও বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে।

লাট সাহেব ইহা জানিয়াছেন যে, এই বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান

সৈন্যগণ ও অন্যান্য প্রজাগণের বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য কার্য্য করিতেছেন এবং নিজের উদ্দেশ্য সাধনার্থে তাহাদিগকে নানা উপায়ে জাতিচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

এই সকল মিথ্যা দ্বারা অনেকে প্রতারিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার লাট সাহেব সকল শ্রেণীর প্রজাগণকে সাবধান করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন এইরূপ অলীক বাক্যে প্রতারিত না হন।

লাট সাহেব সকল শ্রেণীর প্রজাগণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও ধর্ম্মভাব বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকেন।

লাট সাহেব ঘোষণা করিতেছেন যে, ঐ সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে ত্রুটি করিবেন না, তিনি পুনর্ব্বার স্পষ্ট বাক্যে ঘোষণা করিতেছেন, যে গবর্ণমেণ্ট কখনই কোন ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না; এবং ।১৭। সকল শ্রেণীর প্রজাগণের ধর্ম্মরক্ষা ও জাতীয় কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই ও করিবেন না।

লাট সাহেব ও তাঁহার সদস্যগণ কখন প্রজাবর্গকে প্রতারণা করেন নাই, এবং তজ্জন্য তিনি প্রজাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা এই সকল বিদ্রোহসূচক মিথ্যা বাক্যে বিশ্বাস না করেন। যাঁহারা এপর্য্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ রাজভক্তি ও সদাচরণে গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত রহিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট সকলকে রক্ষা করেন, ও সকলের প্রতি ন্যায় বিচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন বলিয়া যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, উপস্থিত ঘোষণাপত্র তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রচারিত হইল।

লাট সাহেব এই সকল প্রজাকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা দুষ্ট বিশ্বাসঘাতকের কথা শুনিয়া বিপদে ও লজ্জায় পড়িবার

পূর্ব্বে যেন সাবধান হইয়া বিবেচনা করেন।

সিসিল বিডন।

সেক্রেটরী।

মে ২১, ১৮৫৭।

হরিশ এই ঘোষণাপত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লাট সাহেব ক্যানিংয়ের পক্ষ সমর্থন করেন। ইংরাজ সম্পাদকগণ ইহাকে ভীরুতার পরিচায়ক বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন।

ক্রমে দিন দিন বিদ্রোহানল প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইল। সমস্ত অযোধ্যা, রহিলখণ্ড, মধ্য ভারতবর্ষ ও বেহারের কতিপয় স্থান উচ্ছৃঙ্খল হইল। কাজে কাজেই দিন দিন সাহেবদিগের ভয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ও দেশীয়লোকদিগের বিরুদ্ধে নানা দোষারোপ করিতে লাগিলেন। অগত্যা গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৭ সালে ১৩ই জুন এক বৎসরের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের ১৫ আইন পাস করিলেন। এই আইনে ইংরাজ ও দেশীয় সম্বাদপত্রের সমভাবে স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হইল। ইংরাজেরা এই কারণে লাট ক্যানিংয়ের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। ইহার পরেই ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া নামক পত্রিকায় "পলাসী যুদ্ধের শত বার্ষিক সমাপ্তি" নামক এক প্রবন্ধ বাহির হইল। ইহাতে দেশীয়দিগের উপর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ঐ কাগজের স্বত্বাধিকারীকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়া পুনর্ব্বার এরূপ মনান্তরসূচক প্রবন্ধ না লেখা হয়, তাহার জন্য অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন। ।১৮। লিখিত আছে যে, এই প্রবন্ধের লেখক মিঃ হেনরি মিড ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিলেন। হেনরি মিড ইতিপূর্ব্বে

দিল্লি গেজেট নামক বিখ্যাত সম্বাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ইনি কলিকাতার গঙ্গায় পার হইবার সময় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এই সময়ে কলিকাতার সাহেবেরা সমস্ত বঙ্গে মার্সিয়াল আইন জারী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন। মার্সিয়াল আইন জারী হইলে বিদ্রোহকারীদিগের বিচার সাহেবেরা স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। হরিশ এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"আমরা কখনই বিশ্বাস করি নাই যে কলিকাতার ইংরাজদিগের কথায় গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিবেন, যে বঙ্গের শাসনকর্ত্তৃত্ব বলশূন্য হইয়াছে, এবং বঙ্গে অদ্য অরাজকতা বিরাজ করিতেছে। বঙ্গের লোকেরা এই বিদ্রোহ বশতঃ অনেক কষ্ট সহ্য করিতেছে, বাণিজ্য বন্ধ হইয়া দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, রাজনৈতিক উন্নতির আশার পথে কণ্টক পড়িয়াছে, সামাজিক উন্নতি কিয়ৎদিনের জন্য বন্ধ হইয়াছে—অদ্য বঙ্গবাসী পরের দোষে এই সকল কষ্ট ভোগ করিতেছে —এবং এই ক্লেশের পিণ্ডান্তে পিণ্ড শেষ করিবার জন্য সাহেবেরা আমাদিগকে আইনবহির্ভূত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন।"

এই সময়ে এ দেশীয়দিগের প্রতি সাহেবদিগের কিরূপ বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহা সেই সময়ের সম্বাদপত্র পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। মনুষ্য রাগে উন্মত্ত হইলে যে জ্ঞানশূন্য হয় তাহার প্রমাণ এই স্থলে পাওয়া যায়।

ইংলিশম্যান কাগজ বলিতে লাগিলেন যে এই সময় হইতে

দেশের সকল প্রকার ক্ষমতা ইংরাজদিগের হস্তে বিন্যস্ত হউক। হরকরা পত্রিকা বলিলেন যে নিম্নতর কর্ম্ম সকল ইংরাজদিগকে দেওয়া হউক এবং ফিমিক্স ফিরিঙ্গিদিগের পক্ষ হইয়া সকল চাকরীই তাহাদিগকে দিতে বলিলেন।

লর্ড ক্যানিং তাহাদের আত্মারাম সরকার হইলেন। তিনি যাহা করিতে লাগিলেন, তাহাতেই দোষারোপ করিতে লাগিল। সাহেবেরা এক সভা করিয়া তাহার নাম ইণ্ডিয়ান রিফরম লিগ রাখিলেন। এই লিগ অর্থাৎ সভা হইতে লর্ড ক্যানিংকে অপমানের সহিত ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহারা বিলাতে দরখাস্ত করিলেন, কিন্তু সে দরখাস্তও লর্ড ।১৯। এলেনবরো না-মঞ্জুর করিলেন। ইহাতে তাহাদের আর ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না।

হরিশ এই সঙ্কট সময়ে লর্ড ক্যানিংয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া দেশের যে কি উপকার করিয়াছিলেন তাহা এক মুখে বলা যায় না। লর্ড ক্যানিং হরিশের সহায়তা পাইয়া যে এই ভীষণ সময়ে ধর্ম্মভাবে দয়া দাক্ষিণ্যের সহিত বিদ্রোহ দমন করিতে পারিয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রাতঃকালে উঠিয়া হিন্দুপেট্রিয়ট পাঠ করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইতেন। কাগজ আসিতে দেরী হইলে সময়ে সময়ে নিজ লোক প্রেরণ করিয়া উহা আনাইয়া লইতেন। পার্লামেণ্ট সভায় যখন এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হয় তখন লর্ড গ্রানবিল হরিশের লিখিত প্রস্তাব সকল পাঠ করিয়া লর্ড ক্যানিংয়ের রাজনীতি সমর্থন করেন।

এই বিবাদের সময়ে ইংরাজদিগের হুহুঙ্কার নাদে ক্যানিংকে সময়ে সময়ে ইংরাজ অনুকূল আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এ

দেশীয়গণ বিনা অনুমতিতে অস্ত্র রাখিতে পারিবেন না ইহা জারী হইল, রাজদ্রোহী সংলিপ্ত অবৈধ কার্য্যের প্রতীকার অভিপ্রায়ে ১৬ আইন পাস হইল। এই আইন বঙ্গে যাহাতে জারী না হয় তাহার জন্য হরিশ বৃথা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৬ আইন যে কেবল রাজবিদ্রোহসূচক গর্হিত কার্য্যের প্রতিবিধান জন্য বিধিবদ্ধ হয় এমন নহে। ইহাতে ঘরজ্বালানি, ডাকাইতি, দাঙ্গা হঙ্গামা প্রভৃতি অবৈধ কার্য্যের শাস্তি দিবার জন্য বিশেষ নিয়ম করা হয়। হরিশ এই সকল নিয়মের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন সাধারণ ফৌজদারী আদালতে এই সকল দোষের বিচার হওয়া উচিত, অন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের হস্তে এ ভার অর্পণ করা উচিত নহে।

বিদ্রোহ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত হরিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে লিখিতে থাকেন। রাজকর্ম্মচারীরা যখন যে আইনবহির্ভূত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাহা হরিশ হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিয়া ক্যানিংয়ের গোচর করিতেন। এই ঘোর বিপ্লবের সময়ে সকল বিষয়েই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে মন মিল ছিল না। গ্রান্ট সাহেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সেই সময়ে ছোটলাট ছিলেন। তিনি একদা ঘোষণা করেন যে, বিদ্রোহীদিগের প্রাণদণ্ড বড়লাটের বিনা অনুমতিতে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। জেনরেল নীল (২০) সাহেব ইহা অবজ্ঞা করিয়া বিদ্রোহী ও অন্যান্য লোকদিগকে যথেচ্ছা হত্যা করিতে আজ্ঞা দেন। হরিশ এই সম্বন্ধে পেট্রিয়টে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে অনুবাদ করা গেল।

"গ্রান্ট সাহেবের হুকুম যদি বড়লাট বজায় না রাখেন তবে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্থানান্তরিত করা ভাল। আর যদি জেনরেল নীল

সাহেবের বৈরনির্যাতন প্রণালী ও এ দেশীয়দিগের সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে কার্য্য করা হয় তবে লাট ক্যানিং ও তাঁহার সদস্যগণ কতিপয় কসাইদারের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া এ দেশ হইতে ত্বরায় চলিয়া যান। কিন্তু যদি তাঁহারা ভারতকে এখন ব্রিটিশ রাজমুকুটের মণি স্বরূপ জ্ঞান করেন, তাহা হইলে করুণা দেবতা (Themesis) যুদ্ধদেবের স্থান অধিকার করিয়া পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগেকে অশেষ ধ্বংস হইতে রক্ষা করুন।"

পঁচেতের রাজা ও হরিশ্চন্দ্র

এই ঘোর বিপ্লবের সময়ে উক্ত রাজার নামে পাটনার কমিসনার রাজবিদ্রোহী বলিয়া অপবাদ দেন। তাঁহার বিচার সময়ে তাঁহার কর্ম্মচারীগণ হরিশকে ৫০ টাকা পুরস্কার দিব এই লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে রাজার পক্ষ হইয়া পেট্রিয়টে লিখিতে বলেন। হরিশ অর্থ লোভে লোভী হইবার লোক ছিলেন না। তিনি ঐ টাকা ফেরত দিয়া তাহাদিগকে বলেন যে তিনি রাজার পক্ষ হইয়া যথাসাধ্য পেট্রিয়টে লিখিবেন। পাঠকগণ বোধহয় হলওয়ে সাহেবের নাম জানেন। ডাক্তার হলওয়ে সাহেবের পিল্ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এই ডাক্তার মহাশয় একদা প্রসিদ্ধ ইংরাজী নাটক লেখক চার্লস ডিকেন্স সাহেবকে ১০০০০ টাকার নোট পাঠাইয়া দিয়া বলেন যে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ নাটক মধ্যে হলওয়ে সাহেবের নাম সন্নিবেশিত করিবেন। ডিকেন্স হলওয়ে সাহেবের পত্রের উত্তর না দিয়া, কিম্বা তৎসম্বন্ধে কিছু গোলযোগ না করিয়া, উক্ত টাকা ফেরৎ দেন।

ইংরাজ মণ্ডলী মধ্যে ডিকেন্স সাহেবের এই শুভ দৃষ্টান্ত যেরূপ প্রীতিকর বঙ্গসমাজে হরিশের দৃষ্টান্তও সেইরূপ। বঙ্গে এই দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় হউক ইহাই আমাদিগের আশা।

১৮৫৭ সালের ৩১ জুলাই গবর্ণর জেনরেল আর একখানি ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেন। বিদ্রোহী ও অন্যান্য লোকদিগের প্রতি অযথা ।২১। কঠোর নিয়ম প্রয়োগ না করা হয় তাহার জন্য রাজ কর্ম্মচারী-দিগকে অনুবোধ করেন। এই ঘোষণা পত্র বাহির হইলে ইংরাজগণ লাট ক্যানিংকে (Clemency) অর্থাৎ "দয়াশীল" ক্যানিং বলিয়া বিদ্রূপ করেন। এ দেশীয় অপরাধী ও নিরপরাধী ব্যক্তি মাত্রের প্রতি ইংরাজগণ খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই ঘোষণা পত্রে তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। হরিশ এই সঙ্কট সময়ে উক্ত ঘোষণা পত্রের সমর্থন করেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে কিয়দংশ অনুবাদ করা গেল।

"বিদ্রোহ দমন অভিপ্রায়ে প্রতিহিংসার কার্য্য যে অযথা রূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। সভ্য গবর্ণমেণ্টের রাজ কর্ম্মচারীগণেরা যে এইরূপ অবৈধ উপায়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবেন ইহা আমরা মনে করি নাই। কেবল আলাহাবাদ নগরে ৬ই জুন হইতে ১৬ই জুলাই পর্য্যন্ত ৮০০ লোকের ফাঁসী হইয়াছে। একজন শীক সৈন্য হত হওয়াতে ঐ নগরের লোকদিগের উপর অত্যাচার মানসে শীক সৈন্যদিগকে আলি হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। কাশী হইতে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত যতদূর ব্রিগেডিয়ার নীল সাহেব গমন করিয়াছেন, সেই স্থানেই রাশি রাশি শবদেহ বিশিষ্ট গ্রাম সকল লক্ষিত হইয়াছিল। ঐ সকল গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে কিছুমাত্র

বাধা দেয় নাই। সৈন্যগণ যে সকল অত্যচার করিয়াছিল তাহার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সৈন্যদিগকে রীতিমত বশে ও শাসনে রাখিলে এইরূপ হইতে পারিত না। গঙ্গায় উভয় পার্শ্বে কেবল ভগ্ন গৃহশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল অত্যাচার নিবারণ এই ঘোষণা পত্রের উদ্দেশ্য ছিল। ইহার স্থূল স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

রাজবিদ্রোহ কিয়ৎ পরিমাণে দমন হইয়া শান্তি পুনঃ সংস্থাপনের পর রাজদ্রোহীদিগের প্রতি কঠোর নিয়মে দণ্ডবিধির আইন সকল চালনা করিলে লোক সকল হয় ত নিরুপায় হইয়া দলবদ্ধ এবং রাগান্বিত হইয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে। এরূপ ফল উৎপন্ন হইলে রাজ্যের কুশল সংস্থাপন করা অতীব কঠিন হইবে। রাজবিদ্বেষও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। অতএব এইরূপ যাহাতে না হইতে পারে তজ্জন্য রাজকর্ম্মচারীদিগকে লাট সাহেব অনুরোধ করেন যে তাঁহারা ক্ষমা ও ঘৃণার সহিত সাবধানে যেন আইন চালনা করেন। গ্রাম ও নগর সকল দগ্ধ।২২। করা নিষেধ করা হইয়াছিল। সিপাহী সৈন্য ইংরাজ রেজিমেণ্ট পরিত্যাগ অপরাধে দণ্ডিত হওয়াও নিষেধ করা হইয়াছিল।

হরিশ এই ঘোষণা পত্রের যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লর্ড ক্যানিংয়ের সমর্থন করিয়াছিলেন এমন নহে। অযোধ্যা ও রহিলখণ্ডে শান্তি পুনঃ সংস্থাপনের জন্য যে সকল ঘোষণা পত্র বাহির হয় তাহারও পক্ষ সমর্থন করেন।

ক্রমে ভগবানের কৃপায়, ও লর্ড ক্যানিং এর দয়া দাক্ষিণ্য গুণে বিদ্রোহ দমন হইল। সুখময়ী শান্তির কোমল মুখচ্ছবির প্রভা ভারতে

পুনঃ প্রকাশ পাইল। পার্লামেন্ট সভায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারত রাজ্য শাসনভার মহারাণীর হস্তে ন্যস্ত হইবার প্রস্তাব হইল। এই প্রস্তাবের পোষকতায় ইণ্ডিয়া বিল পার্লামেন্ট সভায় আলোচিত হইল। হরিশ এই সময়ে ১৮৫৮ সালে এই বিলের পক্ষে বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বড় বড় দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। পরে রাণী স্বয়ং ভারত রাজ্য গ্রহণ করেন। এই সময়ে যে ঘোষণা পত্র বাহির হয় তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল। এই ঘোষণা পত্র আমাদের ম্যাগনাচার্টা স্বরূপ।

শ্রীল শ্রীযুক্তা মহারাণী কুইন ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র

আলাহাবাদ ১৮৫৮ সাল, ১লা নবেম্বর সোমবার

শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরেল বাহাদুর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অনুগ্রহসূচক এই ঘোষণাপত্র ভারতবর্ষের রাজগণ ও সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকট প্রকাশ করিতেছেন।

ভারতবর্ষের সকল রাজা, সর্দ্দার ও সর্ব্বসাধারণ লোকের মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঘোষণাপত্র।

আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরমেশ্বরের অনুগ্রহে, গ্রেটব্রিটেন ও আয়ার্লণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের এবং ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া দেশের অন্তঃপাতী ঐ সংযুক্ত রাজ্যের যে সকল স্থান ও লোক আছে, তৎসমুদয়ের অধীশ্বরী ও ধর্ম্মরক্ষিকা।

ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল কার্য্যের ভার এতৎকাল পর্য্যন্ত

আমাদের সপক্ষে কোম্পানী বাহাদুর নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, সেই ভার পার্লামেণ্ট রাজসভার পরমার্থিক ও সংসারিক লার্ড সাহেব ও কমন্স সাহেব ।২৩। মহোদয়গণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে, আমরা নানাবিধ গুরুতর কারণে আপনারাই গ্রহণ করিতে স্থির করিয়াছি।

অতএব আমরা এই ঘোষণা পত্র দ্বারা সকল লোককে জানাইতেছি ও প্রকাশ করিতেছি যে, আমরা পূর্ব্বোক্ত সভার সভ্যগণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে উক্ত দেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি। উক্ত দেশের মধ্যে আমাদের যে সকল প্রজা আছে, তাঁহাদিগকে এই আদেশ করি যে তাঁহারা সকলেই বিশ্বস্ত হইবেন, ও আমাদের ও আমাদিগের উত্তরাধিকারীগণের নিকটে রাজভক্তি প্রদর্শন করিবেন, ও আমাদিগের উক্ত দেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যে আমাদিগের পক্ষ হইয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্য, আমরা ইহার পরে, সময়ে সময়ে, যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা উচিত জ্ঞান করি, তাঁহাদের আজ্ঞার বশে থাকিবেন।

আরও আমরা আপনাদের বিশ্বাসযোগ্য ও স্নেহপাত্র পরিজন ও মন্ত্রী শ্রীযুক্ত চার্লস জন ভাইকাউণ্ট ক্যানিং সাহেবের ভক্তিগুণ,ক্ষমতা ও সদ্বিবেচনার উপর বিশেষরূপে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া, তাঁহাকে অর্থাৎ উক্ত শ্রীযুক্ত ভাইকাউণ্ট ক্যানিং সাহেবকে আমাদের উক্ত দেশের প্রথম প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরেল করিয়া আমাদের নামে উক্ত দেশের কর্ত্তৃত্ব কার্য্য করিবার ও আমাদের নামে ও সপক্ষে সাধারণ মতে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। কিন্তু আমাদের রাজ্যের প্রধান একজন সেক্রেটারি সাহেবের দ্বারা যে আজ্ঞা ও বিধি সময়ে সময়ে আমাদের নিকট হইতে পাইবেন তিনি তাহা বলবৎ

মানিয়া কার্য্য করিবেন।

কোম্পানী বাহাদুরের অধীনে দেওয়ানী ও সৈনিক কর্ম্মে যে সকল লোক যে যে পদে এইক্ষণে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা স্ব স্ব পদে বাহাল রাখিলাম, কিন্তু তদ্বিষয়ে আমাদের যে কোন বাসনা ইহার পর প্রকাশ হইবে, ও যে সকল আইন ইহার পর বিধিবদ্ধ করা যাইবে, তাহা বলবৎ মানিয়া কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

ভারতবর্ষীয় রাজগণকে এই কথা জানাইতেছি যে কোম্পানী বাহাদুরের দ্বারা, কিম্বা তাঁহাদের দত্ত ক্ষমতানুসারে ঐ রাজগণের সঙ্গে যে সকল সন্ধি ও প্রতিজ্ঞাদি করা হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিলাম ও তাহা অবিকল রূপে বজায় রাখিব, এবং রাজন্যবর্গ তদনুসারে যথাবিহিত কার্য্য করিবেন ইহা আমরা আশা করি। ।২ ।

এইক্ষণে ভারতবর্ষে আমাদের যত অধিকারভুক্ত স্থান আছে তদপেক্ষা আর অল্পমাত্র দেশও অধিকার করিতে চাহি না। পরন্তু আমাদের অধিকারে যে সকল দেশ আছে, এবং সেই সকল দেশে যে স্বত্ব আছে তাহার উপর আক্রমণের কেহ উদ্যোগ করিলে, আমরা অবশ্য তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিব, ইতিমধ্যে অন্য রাজগণের অধিকারের কি স্বত্বের উপর আক্রমণে অভিমতিও দিব না। আমরা নিজের স্বত্ব ও গৌরব, সম্ভ্রম যেমন মান্য করি, সেইরূপ ভারতবর্ষীয় রাজগণের স্বত্বাদিও মান্য করিব। আভ্যন্তরিক শান্তি ও সুশাসনগুণে যে সামাজিক ও অন্যান্য সুখ সমৃদ্ধি উৎপন্ন হয়, আশা করি আমাদের নিজের ও অন্যান্য রাজগণের প্রজাগণ তাহা ভোগ করিবেন।

রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার প্রতিজ্ঞাতে যেমন অন্য সকল

প্রজার নিকটে আমরা বদ্ধ আছি, তেমনি আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রজার নিকটেও বদ্ধ থাকিব। আর সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের প্রসাদে আমরা সেই কার্য্য বিশ্বস্তরূপে ও সরল মনে নির্ব্বাহ করিব। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সত্যজ্ঞান করি কিন্তু তাহাই বলিয়া প্রজাদিগের উপর জোর জুলুম করিয়া সেই ধর্ম্মমত চালাইবার স্বত্ব ও ইচ্ছা আমাদের নাই। ধর্ম্মবিশ্বাস কিম্বা ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিয়া কাহারও প্রতি পক্ষপাত না হয় ও কেহ ক্লেশ দুঃখ না পায়, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

আইন অনুসারে সকলেই তুল্যরূপে ন্যায়মতে ও অপক্ষপাতে রক্ষিত হয় ইহা আমাদের বাসনা। আর আমাদের অধীনে যাঁহারা কর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা আজ্ঞা করিতেছি যে প্রজার ধর্ম্ম বিশ্বাসে কি আরাধনায় তাঁহারা হস্তক্ষেপ না করেন। এইরূপ হস্তক্ষেপ করিলে আমরা অসন্তুষ্ট হইব।

আর আমাদের বাসনা যে প্রজার মধ্যে যাঁহারা উপযুক্ত মতে শিক্ষিত হইয়া কার্য্য নিপুণতা এবং সত্যনিষ্ঠাদিগুণে গুণী হইবেন, তাঁহাদিগকে অবাধে, অপক্ষপাতে, জাতি, ধর্ম্ম, ও বর্ণ অভেদে সকল রাজকার্য্যে নিয়োগ করা যাইবে।

ভারতবর্ষের লোকের পৈতৃক যে ভূমিসম্পত্তি অধিকার করেন তাহাতে তাঁহাদের অত্যন্ত মমতার কথা আমরা অবগত হইয়াছি, সেই মমতা ভাব মান্য করি, ও ভূমি সম্পর্কে তাঁহাদের যে সকল স্বত্ব আছে তাহা আমরা রক্ষা করিতে চাহি কিন্তু গবর্ণমেন্টের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ তাঁহাদিগকে দিতে ।২৫। হইবে। আর আমাদের এই ইচ্ছা যে আইন প্রস্তুত করা ও সেই আইন অনুসারে কার্য্য করার সময়ে ভারতবর্ষের যে রীতি ও আচার ও ব্যবহার পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে

তাহার প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ ও দৃষ্টি রাখা যাইবে।

দুরাকাঙ্ক্ষী লোকেরা যে অমূলক জনরব রটাইয়া স্বদেশীয় লোকদিগের ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহাদিগকে রাজদ্রোহী করায় এবং তাহাদের কার্য্য দ্বারা ভারতবর্ষে যে সকল অমঙ্গল ও যন্ত্রণা হইয়াছে তাহাতে আমাদের অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে। সেই রাজবিদ্রোহ ব্যাপার যুদ্ধস্থলে দমন করিয়া আমাদের শক্তি প্রকাশ হইয়াছে। যাহারা উক্ত প্রকার ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিল কিন্তু এখন পুনরায় কর্ত্তব্য পথে ফিরিয়া আসিতে চাহে, তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদের দয়া প্রকাশ করিতে চাহি।

ইতিপূর্ব্বে এক প্রদেশে অধিক রক্তপাত না হয় ও আমাদের ভারতবর্ষীয় রাজ্যের আরও শীঘ্র শান্তি স্থাপন অভিপ্রায়ে আমাদের প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরেল বাহাদুর বিশেষ সর্ত্ত অনুসারে (for certain terms) ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি ইদানীন্তন গোলযোগ সময়ে আমাদের শাসনের বিপক্ষে অপরাধ করিয়াছে তাহাদিগের অধিকাংশকে উক্ত সর্ত্তানুসারে ক্ষমা করা যাইবে, এবং ক্ষমাতিরিক্ত ঘোর অপরাধ সকলের যে গুরুদণ্ড হইবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণর জেনরেলের উক্ত কার্য্য আমরা স্বীকার করিয়া বলবৎ রাখিলাম। আর নিম্নলিখিত কথা ঘোষণা করিতেছি।

ব্রিটিশ প্রজার হত্যাকার্য্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংলিপ্ত হইবার অপরাধ যাহাদের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত হইয়াছে কিম্বা হইবে, তাহাদিগের প্রতি ন্যায়বিচারানুসারে দয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে না। কিন্তু ঐ সকল অপরাধী ভিন্ন অন্য সকল অপরাধীকে দয়া প্রকাশ করা যাইবে।

জানিয়া শুনিয়া হত্যাকারীদিগকে যাহারা আশ্রয় দিয়াছে কিম্বা রাজবিদ্রোহে যাহারা নিতান্ত উদ্দীপ্তকারী হইয়াছিল তাহাদিগের প্রাণরক্ষা হইবেক ইহা প্রতিজ্ঞা করিতে পারি। কিন্তু যে যে অবস্থায় তাহাদিগের রাজভক্তি স্খলন হইয়াছে সেই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অপরাধীদিগের দণ্ড নিরূপণ হইবে। এবং যে সকল অপরাধ দূরভিসন্ধিবিশিষ্ট লোকের অমূলক জনরবে বিশ্বাস করিয়া উদ্ভূত হইয়াছে সেই সকল অপরাধের প্রতি অধিকরূপে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাইবে। ।২৬।

অন্য যে সকল লোক এক্ষণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেছে—তাহারা ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, স্বীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিলে আমাদের বিপক্ষে তাহাদের যে সকল অপরাধ হইয়াছে—তাহা আমরা অবাধে ক্ষমা করিব ও মনে তাহার স্থান দিব না, এই অঙ্গীকার করিতেছি। যাহারা আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে ঐ নিয়ম মতে কার্য্য করিবে তাহারা সকলেই আমাদের অনুগ্রহ ও রক্ষা পাইবে ইহা আমাদিগের বাসনা।

পরমেশ্বরের প্রসাদে যখন এদেশের মধ্যে শান্তি পুনর্ব্বার স্থাপন হইবে, তখন দেশীয় কৃষিবাণিজ্য ব্যবসায় আদি কার্য্যের উৎসাহ দান, ও সর্ব্বসাধারণের উপকার ও উন্নতি সাধনের সহায়তা করা ও ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের মঙ্গল ও উপকার সাধনে দেশের রাজশাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইবে ইহা আমাদের অত্যন্ত বাসনা। তাঁহাদের সৌভাগ্যে আমাদের বল, তাঁহাদের সুখ শান্তিতে আমাদের নিরাপদতা, তাঁহাদের কৃতজ্ঞতায় আমাদের পুরস্কার লাভ হইবে। প্রজাদিগের মঙ্গলসাধন বাসনায় সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমাদিগকে ও আমাদিগের অধীনস্থ

শাসনকার্য্যকারীদিগকে শক্তি প্রদান করুন।”

এই ঘোষণা পত্রে ভারত রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যে সকল উদার, পাশ্চাত্ত্য রাজনৈতিক মত ও নিয়মাবলী সন্নিবেশিত হয় তাহার জন্য হরিশ্চন্দ্র বহুদিন হইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র একজন বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। দূরদর্শন রাজনীতিজ্ঞের একটি প্রধান লক্ষণ। সেই লক্ষণ হরিশে লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি বহুদিন হইতে লর্ড ডালহৌসীর বলপূর্ব্বক পরের রাজ্য ইংরাজাধিকৃত সাম্রাজ্য মধ্যে সংভুক্ত করিয়া লওয়ার যে কি গৌণ অশুভ ফল ফলিবে তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়গণ এদেশে আসিয়া দেশবাসীর হস্ত হইতে সমস্ত সম্ভ্রমসূচক উচ্চপদ ক্রমে ক্রমে কাড়িয়া লইলে তাহার যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে তাহাও অনুধাবন করিয়া ইংরাজরাজকে সতর্ক কবিয়াছিলেন। এই সকল স্বার্থ শাসনপ্রণালীর ফলে বিষম অনিষ্টকারী সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিদ্রোহ দমনান্তে বুদ্ধিমান ও সভ্য ইংরাজগণ বুঝিতে পারিলেন যে স্বার্থ শাসনপ্রণালী অনিষ্টকারী ও ভ্রান্তিমূলক। কাজে কাজেই এই ঘোষণাপত্রে নূতন উদার মতের উপর ইংরাজ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। ।২৭। হরিশের বহু কালের আশা ও যত্ন ইহাতে সফল হইল দেখিয়া তিনি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহে যে রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হয় তাহার ন্যায় মানবসমাজের অনিষ্টকারী ঘটনা ইতিহাসমধ্যে দুই একটি দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী দেশে যে রাজ্য-বিপ্লব ঘটে তাহার সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্য

এই স্থানে বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ফ্রান্সে যেমন এই বিপ্লবে অসংখ্য নরনারীর রক্তে দেশ প্লাবিত হইয়াছিল, সমাজ কিয়দ্দিনের জন্য উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সামাজিক, নৈতিক, ও রাজনৈতিক উন্নতির পথে কণ্টক প্রদান করিয়াছিল, ভারতবর্ষেও সিপাহী বিদ্রোহ বশত তদনুরূপ বিষময় ফল ফলিয়াছিল। হরিশ এই সময়ে রাজভক্তি গুণে ইংরাজ শাসনের উপকারিতা বুঝিয়া ইংরাজ রাজ্যের পক্ষে দণ্ডায়মান হন। তিনি বিদ্রোহীদিগের গর্হিত কার্য্যে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে ঘৃণা সত্ত্বেও রাজকর্ম্মচারীগণ যখন বিদ্রোহীদিগের প্রতি যে গর্হিত আচরণ করিয়াছিলেন তাহার প্রতিবিধানের জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ধৈর্য্য, সাম্য, সাহস, ক্ষমা, দাক্ষিণ্য, দূরদর্শন এই সকল গুণে তিনি গুণী হইয়া এই লোমহর্ষণ সময়ে তিনি যোদ্ধার ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধের কামান তাঁহার সুলেখনী, মসী কামানের বারুদ। "রাজদ্বারে শ্মশানেচ যঃ তিষ্ঠতি স বান্ধব।" এই প্রাচীন উৎকৃষ্ট মন্ত্র হরিশের জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল। ভারতের কোটি কোটি নিঃসহায় লোকের পক্ষ হইয়া একাকী রাজদ্বারে অযাচিত প্রতিভূস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। লক্ষ লক্ষ নরনারীর অকালমৃত্যু হইতে শ্মশান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এইজন্যই তাঁহাকে ভারতহিতৈষী বলে।

১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্ষ সমালোচনার উপলক্ষে হরিশ্চন্দ্র বিদ্রোহ সম্বন্ধে যে সারবান্ সুদীর্ঘ বিশদ প্রবন্ধ ইংরাজীতে লেখেন তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিলাম। এরূপ সুন্দর ইংরাজীতে লিখিত প্রবন্ধ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই ১৮৫৭ সাল মানব ইতিহাসের একটি ভীষণ সন্ধিস্থল স্বরূপ। আমাদের পরবর্ত্তী মানবগণ যে কিরূপভাবে ইহার গৌরব উপলব্ধি করিবেন আমরা তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে অক্ষম। আমরা এই সিপাহী বিদ্রোহ ।২৮। ঘটিত এখানকার অবরোধ, ওখানকার হত্যাকাণ্ড, সেখানকার সংগ্রাম, এই সকলেরই ভাবনা ভাবিতেছি। সমগ্র বিদ্রোহের পূর্ণমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছি না। এই বিদ্রোহ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত হঠাৎ আসিয়া মহাবেগে মস্তকে পতিত হইল, আমরা সকলেই ভীত ও চমকিত হইয়াছি, এমন কি বিদ্রোহী সেনা সকলও চমকিত হইয়াছে। গত ৮ মাস যাবৎ এই বিদ্রোহ ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ওতপ্রোত ও বিধ্বস্ত করিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার পাপ এবং দুঃখ সর্ব্বত্র ছড়াইয়াছে। এখন ইহা তেজহীন হইয়াছে, ইহার পরিণাম বুঝিতে পারা যাইতেছে, দীর্ঘকাল স্থায়ী কতকগুলি দুঃখ ভারতবাসীকে উত্তরাধিকারী ভাবে দান করিয়া অন্তর্হিত হইবে তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

(১) প্রথম এই বিদ্রোহের জন্য আমাদের জাতীয় চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে। অন্যদিকে যে যাহা নিন্দা করুক হিন্দুর জাতীয় চরিত্র জগৎবাসীর চক্ষে বড় উচ্চ বলিয়াই পরিগণিত ছিল। কেহ কেহ আমাদিগকে কুসংস্কারাবিষ্ট বলিয়া নিন্দা করিলেও তাহাদিগকেই বলিতে হইত যে আমরা বুদ্ধিজীবী। আমাদের স্বজাতিবাৎসল্য বা সমর নিপুণতা না থাকিলেও অন্যদিকে আর শত সহস্রগুণ আছে বলিয়া সকলে স্বীকার করিতেন। চিরকাল আমরাই কষ্টভোগ করিয়াছি কিন্তু কেহ বলিতে পারেন না যে আমরা কাহাকেও কষ্ট

দিয়াছি। আমাদের পুরাণে, ইতিহাসে, সংহিতায়, সাহিত্যে এমন অনেক বিষয় আছে যাহাতে কি পণ্ডিত কি বিষয়ীলোক উভয়েরই অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। এইজন্য আমাদের জাতির প্রতি বিদেশীয় বিদ্বান লোক সসম্মান প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আমাদের প্রতি বিদেশীয় এই সম্মান, এই প্রীতি একেবারে ধ্বংস হইল। বিদ্রোহের আনুষঙ্গিক যে সকল অত্যাচার হইয়াছে তাহা সত্য সত্যই অভাবনীয়। অন্যায়রূপে অসঙ্গতরূপে এই সকল অত্যাচারের অপরাধ আমাদের জাতির প্রতি আরোপিত হইয়াছে। বিদ্রোহ হইলে যে অরাজকতা হয়, সেই অরাজকতার জন্য যে সকল অত্যাচার হয়, সেই সকলের জন্য যে বিদ্রোহীরা দায়ী তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু একথা স্বীকার করি না যে একটি সমাজের কতকগুলি অপদার্থ নরাধম লোকের কৃতকার্য্যের জন্য সেই সমগ্র সমাজ দায়ী হইবে।

আমরা যে কেবল সভ্য জাতির সম্মাননা হারাইয়াছি, এমন নহে, সাক্ষাৎ।২৯। সম্বন্ধে আমাদিগের অন্যদিকেও ক্ষতি হইয়াছে। ভারতবাসীর সহিত সমগ্র ইংরাজ জাতির সম্পূর্ণ পার্থক্য সংঘটন হইয়াছে। এখন তাঁহারা যে কেবল আমাদিগকে সন্দেহ করেন এমন নহে, আমরা তাঁহাদের দারুণ শত্রুতার স্থল হইয়াছি। ভারতবাসী ইংরাজরা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদিগকে দেশ হইতে বিদূরিত করিবার জন্য আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি এবং সেই অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র।

এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক হইলেও ইহার ফল অতি ভয়ঙ্কর, কাজে কাজেই আমরা এই বিশ্বাসে উপহাস করিতে পারি না।

আমাদের দ্বিতীয় মহা ক্ষতি সভ্যতা সম্বন্ধে। কিছুকালের জন্য এমন আশঙ্কা হয় যে, অনেক দিনের জন্য আমাদের সামাজিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইল। যদি আইনবলে কোন বর্ব্বর, নিষ্ঠুর, অসঙ্গত সামাজিক প্রথার সংশোধন আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমরা আইনের সাহায্য চাহিলেও এখন আর পাইব না। সেই সকল কুসংস্কারের মূল উৎপাটনের আশা একেবারে চূর্ণ হইল। ব্যবস্থাপকগণ আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে একবারেই হস্তার্পণ করিবেন না, এই নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। এখন হয়ত আমরা উত্তম বিচারালয় পাইব, ন্যায়ানুগত ব্যবস্থা সকল পাইব, কর নির্দ্ধারণের সুনিয়ম সকল পাইব, কিন্তু আমাদের অন্তরে অন্তরে যে সকল কুপ্রথা কীট প্রবেশ করিয়া অস্থিমাংস ভক্ষণ করিতেছে, সে সকল নিষ্কাশিত করিব, এই বিদ্রোহের জন্য সে ভরসা আর আমাদের নাই।

দেশের বৈষয়িক উন্নতি কিছুকালের জন্য স্থগিদ হইল। আমাদের রেলওয়ের আর বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক কতকটা নষ্টই হইয়াছে। আর বৎসর এমন দিনে বৈদ্যুতিক তার যোগে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সম্বাদ বাহিত হইয়াছে, এখন সেই সকল তার ছিন্নভিন্ন ও চূর্ণীকৃত হইয়া রহিয়াছে। শাসন কর্ত্তৃগণ আত্মরক্ষার দায়ে খাল খনন পথ প্রস্তুত করণ প্রভৃতি কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ধনে প্রাণে লোকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে—এখনও যে কত ক্ষতি হইবে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? ভারতবাসীদিগকে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে এই বিদ্রোহের ফলভোগ করিতে হইবে। এই সকল দুশ্চিন্তা হইতে জগদীশ্বরের অচিন্তনীয় এবং অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে

বিশ্বাসই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। ইতিহাসে বিশ্বাসবান ব্যক্তি প্রত্যেক ঘটনাতেই ।৩০। উন্নতির সোপান দেখিতে পান ; ভারতের এই বিদ্রোহ ঘটনা, যত কেন ভয়াবহ হৌক না, ঐতিহাসিক নিয়মের বহির্ভূত নহে ; এবং ১৮৫৭ সাল যদিও রক্তময় এবং অগ্নিময় অক্ষরে চিহ্নিত, তথাপি বোধ হয়, পৃথিবীর জনসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ—এই ভারতবাসী এই সাল হইতেই অশ্রুতপূর্ব্ব উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর নীল বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহে হরিশ বঙ্গ সমাজের ও বঙ্গীয় নিঃসহায় কৃষক সম্প্রদায়ের কি উপকার করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে যথাসাধ্য বর্ণনা করা হইল।

নীল বিদ্রোহ

এই বিদ্রোহের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এই পুস্তকের অল্প স্থান মধ্যে বিশেষ রূপে বর্ণনা অসম্ভব। ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিতে হইলে স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের আয়ত্বস্থিত অল্প স্থানের মধ্যে যথাসম্ভব উহার স্থূল স্থূল ঘটনা, ও তৎসম্বন্ধে হরিশের কার্য্যকলাপ বর্ণিত হইল।

নীলের চাষ অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। ইণ্ডিগো অর্থাৎ নীল, ইণ্ডিকম্ (Indicum) এই শব্দ হইতে উৎপন্ন, অর্থাৎ ভারতবর্ষ জাত বলিয়া ইহার নাম ইণ্ডিগো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশের দেওয়ানী ভার প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা

ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীগণ এই নীল চাষে প্রবৃত্ত হন। অধ্যবসায় ও নিপুণতাগুণে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা নীল উৎপন্নে ও উহার ব্যবসায়ে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হন। মিসনারী প্রমুখ রেভারেণ্ড ডাক্তার ডফ সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ পত্রে উল্লেখ করেন যে, এই শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে, কেবল বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রতি বৎসর এক কোটি হইতে ৪ কোটি টাকার নীল ইউরোপে রপ্তানী হইত।

ইণ্ডিগো কমিসন রিপোর্টে জানা যায় যে বাঙ্গালা দেশের নীল, বিশেষতঃ নদীয়া ও যশোহর জেলার নীল পৃথিবীর সকল স্থানের নীল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। নদীয়া জেলায়, ১৮৬০ সালের পূর্ব্বে, ১৮ লক্ষ টাকা নীল উৎপন্নের জন্য প্রতি বৎসর ব্যয় হইত। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট উক্ত স্থানের ভূম্যধিকারীগণের নিকট হইতে ভূমির রাজস্ব স্বরূপ যে ১২ লক্ষ টাকা পান, ।৩১। তদপেক্ষা ৬ লক্ষ টাকা নীলকরেরা প্রতি বৎসর ব্যয় করিতেন। বাঙ্গালায় প্রতি বৎসরে ১০৫০০০ মণ নীল উৎপন্ন হইত। ইহার মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা।

পূর্ব্বোক্ত তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, সাহেবেরা এই নীল চাষের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতেন। বিদেশে আসিয়া পরের জমীতে চাষ করা বড় সহজ নহে। পরের নিকট হইতে জমী লইতে হইবে, পরের প্রজা দ্বারা নীল চাষ করাইয়া লইতে হইবে, এইজন্য সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্য চাহিতে হইয়াছিল। বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, মফস্বলে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইংরাজগণ থাকিলে রাজ্যের শান্তি রক্ষা ও শাসনের সুবিধা হইবে, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যোন্নতি হইবে, ইহা

ভাবিয়া নীলকরের সানুকূলে সময়ে সময়ে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৮২৩ খৃঃ ৬ আইন প্রকটিত হয়। নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে নীল চাষের জন্য কোন নীলকর, বীজ কিম্বা টাকা দাদন দিলে, যদি দাদনগ্রাহী চুক্তিভঙ্গ করিত, তাহা হইলে চুক্তিভঙ্গের জন্য জজ সাহেবের নিকট নালিশ করিতে পারিতেন। জেলার জজ সাহেব সরাসরি বিচার করিয়া, উক্ত জমীর উৎপন্ন বস্তু ক্রোক দিয়া বাদীকে ডিগ্রী দিতে পারিতেন।

১৮৩০ খৃঃ ৫ আইনে নীলের চুক্তিভঙ্গের সম্বন্ধে কারাদণ্ড বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের দ্বারা রদ হয়। কিন্তু ১০ আইনে ইচ্ছাপূর্ব্বক নীল ক্ষতি করিলে, অর্থ ও কারাবাস উভয় দণ্ডই বিধিবদ্ধ হইয়াছিল ; এবং যে সকল প্রজারা নীলকুঠীর সহিত হিসাব মিটাইয়া কারবার বন্ধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের মোকদ্দামার বিচার জজসাহেব সরাসরি মতে করিতে পারিতেন।

এই সকল আইন বলে, নীলকরগণ চাষের অনেক সুবিধা পাইয়াছিলেন। কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়া যে দেশের অন্তর্বাণিজ্যের বহুল উপকার হইয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নীলকরেরা সময়ে সময়ে এই অর্থ দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কৃত করিয়া গ্রাম সকল বসাইয়া ছিলেন ; সময়ে সময়ে রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; সময়ে সময়ে কৃষকদিগের জন্য, স্কুল ও চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল, এবং সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষকালে প্রজাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেন এবং ইহাতে দেশের যে উপকার হইয়াছিল

 তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ইষ্টসাধন

করিতে গিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের কার্য্যপ্রণালীর দোষে, ইষ্ট অপেক্ষা বহুতর অনিষ্ট হইতে লাগিল। নীলের চাষ প্রজার পক্ষে ক্ষতিজনক হইল। নীলের দাদন জোর করিয়া প্রজাদিগকে দেওয়া হইত, এবং এই দাদন একবার লইলে প্রজারা তাহা ৪ পুরুষ মধ্যে শোধ করিতে পারিত না। দাদন রীতিমত দেওয়া হইত না। প্রজাকে নীল বপনের ব্যয় দিতে হইত, জমী নিড়াইতে হইত, নীল কাটিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া কুঠিতে আনিয়া দিতে হইত। এই সকল কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক কিছুই পাইত না। এইজন্য প্রসিদ্ধ বঙ্গের নাটক লেখক স্বর্গীয় বাবু দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় নীলের দাদনকে "গোপাল গাদন" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নীলকুঠীর চাকরেরা প্রজাদিগের বাঁশ, খড় ও বাগানের ফল ফুলুরী জোর করিয়া লইতেন। অপরাপর আনুষঙ্গিক দৌরাত্ম্য ১২৯৩ সালের কার্ত্তিক মাসের নবজীবনে "সেকালের দারোগোর কাহিনী" নামক প্রবন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"নীলকরের দৌরাত্ম্য বলিয়া আমাদের মধ্যে যে চিরপ্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা ঘটিবার দুইটি মূল কারণ ছিল। ঐ দুইটি কারণ দূর করা অসাধ্য না হইলেও নীলের ব্যবসার অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এমন কঠিন কার্য্য ছিল, যে তাহা প্রায় অসাধ্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। তাহার প্রথম কারণ এই যে, ধানের ভূমিতেই নীল উত্তম জন্মে এবং ভূমি যত উৎকৃষ্ট হয়, নীলও সেই পরিমাণে অধিক উৎকৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ নীলের ও ধানের চাষ একই সময়ে সম্পাদিত হয়। কিন্তু কৃষকেরা ধানের চাষেরই অধিক

পক্ষপাতী ; নীলের চাষ করিতে সহজে ইচ্ছা করে না। কারণ ধানে প্রজার সম্বৎসরের আহার, গরুর খোরাক এবং অন্যান্য অনেক প্রকার উপকার হয় কিন্তু তাহারা নীলকর সাহেবদিগের নিকট নীলের গাছের জন্য যে মূল্য পাইত, তাহাতে তাহাদের তত্তুল্য লাভ হইত না। বিশেষ সাহেবেরা যত কম মূল্যে প্রজার দ্বারা নীল জন্মাইয়া লইতে পারিতেন, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেন। ধানের ন্যায় নীলের বাজার দর ছিল না। সাহেবেরা যে এক দর স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই হারে চিরকাল ধরিয়া, জন্মা অজন্মার তারতম্য বিবেচনা না করিয়া, প্রজাদিগের নিকট নীলের গাছ লইতেন, এবং সেই হারও প্রজাদিগের ইচ্ছামতে স্থিরী।৩৩। কৃত হয় নাই, সাহেব দিগের ইচ্ছামতে স্থির হইয়াছিল, এবং ইহাতে কৃষকদের কখনও লাভ না হইয়া বরং বৎসর বৎসর সাহেবের নিকট তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত। অধিকন্তু প্রজাদিগের উত্তম জমী সকলে নীলকরেরা তাহাদিগকে নীল ভিন্ন অন্য কিছু বপন করিতে দিতেন না। সুতরাং নীলের প্রতি, প্রজার সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং পারগপক্ষে তাহারা নীলের চাষ করিতে ইচ্ছা করিত না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, নীল এবং ধান একই সময়ে কর্ত্তন করিতে হয় কিন্তু অগ্রে নীল কর্ত্তন করিয়া কুঠীতে দাখিল না করিলে, কুঠীর লোকে প্রজাদিগকে তাহাদের স্বীয় ধানে হস্তক্ষেপণ করিতে দিত না, ইহাতে প্রজার অনেক বিরক্তি বোধ হইত এবং ক্ষতি হওয়ারও আশঙ্কা থাকিত।"

এই সকল অত্যাচার হইতে আরও ভয়াবহ অত্যাচার উত্থিত হইল। সময়ে সময়ে গৃহদাহ, গুমখুরী, বাজার দাহ, ও স্ত্রীলোকদিগের

প্রতি অত্যাচার করা হইত। জমীদারদিগের নিকট হইতে ভূমি সকল পত্তনী কিম্বা ক্রয় করিবার জন্য, সময়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও অত্যাচার দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে জোরপূর্ব্বক ও ছলে বলে কাড়িয়া লওয়া হইত। সুতরাং এই সকল কারণে প্রজা ও ভূম্যধিকারীগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে এই অত্যাচার প্রবল হইয়া নীল হাঙ্গামা উপস্থিত হইল। প্রজারা স্পষ্টাক্ষরে নীলচাষ করিব না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইল। এইরূপ অসন্তোষভাব যে একদিনে, বা ব্যক্তিবিশেষের উত্তেজনায় হইয়াছিল তাহা নহে। ইহা বহুদিনের অত্যাচারের ফল। রেভারেণ্ড ডাক্তার ডফ তাঁহার প্রসিদ্ধ পত্রে বলেন যে, যে কারণে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ওয়াট টাইলর পোল ট্যাক্স কালেক্টরকে হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করিলে যেমন ইংলণ্ডের প্রজাগণের লুকায়িত ক্রোধাগ্নি একবারে ঘোর বিদ্রোহরূপে প্রজ্বলিত হইল, সেইরূপ নীলের বহুকালের অত্যাচার প্রতিরোধে, স্বর্গীয় আসলি ইডেন মহাশয়ের পরওয়ানা পাইয়া বারাসত প্রভৃতি জেলার প্রজাগণ বিদ্রোহী হইল।

চিরস্মরণীয় স্বর্গীয় মহাত্মা আসলি ইডেন তখন বারাসত জিলার (এখন সবডিভিসন অর্থাৎ মহকুমা) জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৮৫৯ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি এক রোবকারী জারী করেন। এই রোবকারীতে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, প্রজার জমীতে নীলকরেরা জোর করিয়া নীল ।৩৪। বপন করিতে আসিলে, সেই অত্যাচার হইতে মাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবেন। এই রোবকারীর বলে প্রজারা নীল চাষে অসম্মত হইল। মনুষ্য দৃষ্টান্তের অনুকরণ করেন। বারাসতের দৃষ্টান্ত দেখিয়া যশোহর প্রভৃতি স্থানের প্রজারা নীল চাষ

বন্ধ করিল। নীলকরেরা বৈরনির্যাতনে ব্যস্ত রহিলেন। কলিকাতার নীলের মহাজনগণ ও মফস্বলের নীলকরেরা দলবদ্ধ হইয়া ইডেনের বিরুদ্ধে ছোটলাটের নিকটে দরখাস্ত করিলেন। আর একবার ১৮৫৫ সালে মেঃ ম্যাঙ্গলস্ বারাসতে ঐরূপ প্রজার প্রতি সহানুভূতির আভাস দেখাইলে, ম্যাঙ্গলস্কে গবর্ণমেন্ট ভর্ৎসনা করিয়া সেই স্থান হইতে বদলী করেন। নীলকরেরা ভাবিলেন এবারও বুঝি তাহাই হইবে। কিন্তু ইডেন সহজে নরম হইবার লোক ছিলেন না। কমিসনার গ্রোট সাহেব ও ইডেনের মতভেদ হইলেও, ছোটলাট যে, পি গ্রাণ্ট মহাশয় ইডেনের মতে মত দিলেন। এই সময়ে মুসলমান সম্প্রদায়নেতা মহামান্য মৌলবী আবদুল লতীফ খাঁ মহাশয় (পরে নবাব বাহাদুর) কলেরেওয়া থানা হইতে এক পরওয়ানা জারী করেন বলিয়া সাহেবেরা কুপিত হইয়া তাঁহাকে সেই স্থান হইতে স্থানান্তরিত করান। ইডেন মহোদয়ের এই পরওয়ানার ন্যায় নদীয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট মেঃ হারসেল সাহেব এক পরওয়ানা দামুড়হুদা (যাহা এখন চুয়াডাঙ্গা বলিয়া অভিহিত) সবডিভিসনের জইন্ট মাজিষ্ট্রেট মেঃ ম্যাকলিন্ সাহেবের নিকট পাঠান। এই সকল পরওয়ানায় প্রজারা বুঝিয়াছিল যে নীলচাষ তাহাদিগের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। হোয়াইট সাহেব নামক একজন নীলকর হাঁসখালীর কুঠীতে অত্যাচার করায় বেতনা গ্রামের প্রজারা সর্ব্বপ্রথমে নীলচাষ করিতে অসম্মত হয়।

এইরূপে নীল বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। একদিকে পাবনা, যশোহর, নদীয়া, বারাসত ও অন্যান্য জেলার লক্ষ লক্ষ প্রজা, অন্য-দিকে প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী বিদ্বান সভ্য নীলকর সাহেবগণ। এই দুই দলের বিবাদ সামান্য বিবাদ নহে। বিবাদের মূল কারণ পূর্ব্বেই বলা

হইয়াছে। অত্যাচার ইহার মুখ্য কারণ। আনুষঙ্গিক অন্যান্য কারণে এই বিবাদ এক ভীষণ ভাব ধারণ করিল। এই বিবাদের মধ্যে বঙ্গের ভূম্যধিকারীগণের অনেকে লিপ্ত হইলেন। বঙ্গের ভূম্যধিকারীগণ, বিশেষতঃ কলিকাতার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জমীদারগণ বিশেষ বুদ্ধিমান ও অনেকেই বিদ্বান ছিলেন। ।৩৫। রাণাঘাটের পালচৌধুরী স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীগোপাল পালচৌধুরী, শান্তিপুরের ৺শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র রায় যাঁহাকে সচরাচর মতিবাবু বলে, উলার ব্রাহ্মণ জমীদার শ্রেষ্ঠ ৺বামনদাস মুখোপাধ্যায়, ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লাটুদহের ৺পরাণপাল, নড়ালের প্রসিদ্ধ ৺রতন বাবু ও কলিকাতার শ্রদ্ধাস্পদ ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর, উত্তরপাড়ার পূজনীয় জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য জমীদারগণ এই নীল বিদ্রোহে সংলিপ্ত হইলেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই বিষয়বুদ্ধি ও অন্যান্য সৎগুণে প্রশংসিত ছিলেন। ইঁহারা এই অত্যাচার নিবারণ মানসে প্রজার সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণনগরের মহামান্য মানবকুল-হিতৈষী খৃষ্টিয়ান পাদরিগণ দরিদ্র প্রজার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অত্যাচার নিবারণে সহায়তা করিলেন। শান্তিপুরের রেভারেণ্ড ছি, বমওয়েস সাহেব, প্রাতঃস্মরণীয় রেভারেণ্ড লং সাহেব, রতনপুরের রেভারেণ্ড এফ্., স্থুর সাহেব ও অন্যান্য ধার্ম্মিক মিসনারীগণ ইহাতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা যে এই সঙ্কট সময়ে মানবহিতের জন্য স্বদেশবাসী ইংরাজ নীলকুঠীয়ালদিগের অত্যাচার স্বীকার করিয়া তৎপ্রতিবিধানে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা মনে করিলে ইংরাজ চরিত্রের মহানুভবতা ও উচ্চতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত না করিয়া জনসাধা-

রণের মঙ্গলের জন্য যে তাঁহারা এই সৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন ইহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও প্রীতিকর। বলা বাহুল্য যে তাঁহাদের সাহায্যে প্রজাগণের এই অত্যাচার অনেক পরিমাণে কমিয়াছিল।

রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে উদারচেতা, নির্ভীক, মেঃ ডভলিউ, যে, হারসেল, মেঃ আস্‌লি ইডেন, ও মেঃ ই, ডি, লাটুর সাহেব মহাশয়গণ প্রজার দুঃখে দুঃখী হইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রজারা মূর্খ হইলেও এই সকল সহানুভূতির কথা নানাপ্রকারে বুঝিতে পারিয়াছিল। যাহারা খবরের কাগজ পড়িত তাহারা ত বুঝিতেই পারিবে। অন্যান্য মূর্খলোক, কেহ বা কথায়, কেহ বা ইঙ্গিতে, ও কেহ বা কার্য্য দ্বারা বুঝিতে পারিল যে নীলের অত্যাচার আর সহ্য করিবার প্রয়োজন নাই। স্বর্গীয় রেভারেণ্ড লং সাহেব তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন যে, নীল অত্যাচারের কথা তদানীন্তন বাঙ্গালা সম্বাদপত্র দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে লোকের নিকট প্রচারিত হইয়াছিল। নীলসংক্রান্ত অত্যাচারসূচক গান সকল গ্রামে গীত হইয়াছিল। ।৩৬। কলিকাতার লোক মফস্বলে গিয়া কথাবার্ত্তায় ইহার আন্দোলন বৃদ্ধি করিয়াছিল।

যে সকল অত্যাচারে এই নীল বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত ইণ্ডিগো কমিসনের রিপোর্টে লিখিত জবানবন্দী হইতে নিম্নে অনুবাদ করিয়া সন্নিবেশিত করা গেল।

রেভারেণ্ড ফ্রেডারিক স্থরের জবানবন্দীর কিয়দংশ

রতনপুরের কনসারনের ভিতরে এক খৃষ্টিয়ান বাস করিত।

তাহার পুত্র আমার নিকটে চাকরী করিত বলিয়া পূর্ব্ব নিবাস রতনপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাপাসডাঙ্গায় আসিয়া বাস করে। রতনপুর কুঠীর ম্যানেজার দাদন লইয়াছে বলিয়া ইহাকে কুঠীর নীল তৈয়ার করিয়া দিতে বলেন। কিন্তু সে বলিল যে মহাশয়দিগের নিশ্চিন্দিপুরের যে কুঠী আছে সেই কুঠীতে আমি নীল দিব, রতনপুরে এখন আমি থাকি না, এইজন্য আমার হিসাব রতনপুরের খাতা হইতে নিশ্চিন্দিপুরের কুঠীর খাতার সামিল করিলে ভাল হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

একদা হঠাৎ কোন রবিবারে যখন আমাদের গিরজায় লোক উপাসনায় সমবেত হইয়াছেন, এমন সময়ে গরুর রাখাল দৌড়িয়া আসিয়া বলিল যে রতনপুরের নীলকুঠীর চাকরেরা অমুক খৃষ্টানের গরু সকল মাঠ হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল। খৃষ্টানেরা গিরজা হইতে বাহির হইযা মাঠে গিয়া গরু ছিনিয়া আনিল। আমি তখন কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিলাম। এই সংবাদ পাইয়া রতনপুরে শীঘ্র ফিরিয়া গেলাম। আমার বন্ধুগণ কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে একথা জানাইয়াছিলেন, এবং তিনি ইহার প্রতীকার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু আমি ভাবিলাম যে আমাদের ধর্ম্মানুসারে এ কথা নীলকুঠীয়ালদিগকে বলাই ভাল। উক্ত কুঠীর সাহেব আমার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া দোষ স্বীকার করিলেন ও আমার নিকট ক্ষমা চাহিলেন, এবং উক্ত ব্যক্তির হিসাব নিশ্চিন্দিপুরের কুঠীর খাতায় তুলিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন।

১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে ৭ জন খৃষ্টান গাড়ী করিয়া নীল মাঠ হইতে কুঠীতে পহুছিয়া দিবে বলিয়া দাদন গ্রহণ করে। কয়খানা

গাড়ী প্রতিদিন খাটিতে লাগিল তাহার হাতচিটা চাহিলে তাহা দেওয়া হইল না। হাতচিটা ।৫৭। না পাওয়ায় তাহারা একদিন কাজ বন্ধ করে। নীলের এক আমিন আসিয়া বলে যে তাহাদিগের গরু কাড়িয়া লইয়া যাইবে। তাহারা এই কথা আমাকে বলিলে আমি উহা অবিশ্বাস করি। বেলা ৪টার সময়ে যখন আমি বসিয়া লিখিতেছিলাম, এমন সময়ে তাহারা আসিয়া বলিল যে লাঠিয়ালেরা আসিয়া গরু কাড়িয়া লইয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া গরু সকল ফিরাইলাম। আর এক দিকে দেখিলাম যে প্রায় ৮০টা গরু একজন আমিন ও ৮ জন লাঠিয়ালে খেদিয়া লইয়া যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া আমিন বলিল "খাড়া রও", "সাহেবকে মার"। আমি বলিলাম যে আমি দেখতে এসেছি। শুনিলাম একজন লাঠিয়াল আমার পেছন দিক হইতে ঘোড়ার রাশ ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং আমাকে এক লাঠির গুতো দিতে গিয়া সেই গুতো আমার সহিসের গায়ে লাগে। এই কথা নীলকুঠীয়ালকে জানাইলে তিনি বলিলেন যে, "তোমার নিজের কাজ করগে যাও, এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিবার প্রয়োজন নাই।" আমি মাজিষ্ট্রেটকে এই বিষয় জানাইলে তিনি দারোগাকে পাঠাইয়া দেন। দারোগা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে ঐ সকল গরু কুঠীতে আবদ্ধ আছে। গ্রাণ্ট সাহেব পোষ্ট আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে বলেন যে এ বিষয়ে মিটাইয়া ফেলুন। আমি তাঁহার কথা মতে নীলকরের সঙ্গে দেখা করিয়া এ বিষয়ে মিটাইয়া ফেলি।

জোরপূর্ব্বক গৃহনষ্টের দৃষ্টান্ত

জেলা নদীয়ার অন্তর্গত বাগদা থানার খাঁপুর নিবাসী আমির মল্লিকের জবানবন্দী—

আমি একজন গাঁতিদার। আমার গাঁতির জমা ৫৮ টাকা। প্রায় ৫ কিম্বা ৬ বৎসর হইল লারমুর সাহেব আমায় নীলের দাদন লইতে বলেন। আমার লাঙ্গল ও গরু না থাকায় দাদন লইতে অস্বীকার করি। আমার কোর্ফা প্রজারা দাদন লয়। তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। আমাকে পীড়াপীড়ি করিলে আমি পলাইতাম। একদা হিল্‌সামারী কুঠীর দেওয়ান যাদু বিশ্বাস আমার বাটী আসিয়া আমার ছেলেদিগকে আমায় বাহির করিয়া দিতে বলে। তাহাদিগকে প্রথমে হিল্‌সামারী ও তৎপরে কাঠগড়ার কুঠীতে ধরিয়া লইয়া যায়। ইহার ৪।৫ দিন পরে উক্ত দেওয়ান অনেক।৩৮। লোক লইয়া আমার পাকা বাটীর তিনটি কুঠারী ও প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলে ও তিনটি ধানের গোলা লুঠ করে। পুষ্করিণীর মাছ ধরিয়া লাঠিয়াল-দিগকে বিলাইয়া দেয়। পলাইবার সময় আমার পা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে আমি ৪।৫ মাস কাতর ছিলাম, সেই জন্য নালিস করিতে পারি নাই। সুস্থ হইলে অনেক দেরী হইয়াছে বলিয়া নালিস করি নাই। আমার সন্তানদিগকে কাঠগড়ার কুঠীতে ৪।৫ মাস কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল।

অন্যায় অবরোধের দৃষ্টান্ত

রতনপুর কুঠীর নিকট হাঁন্ট্রা থানার এলাকায় ভবারপুর গ্রামের নিবাসী গনি দফাদারের জবানবন্দী—

আমার পিতা একজন পোলিসের চৌকিদার ছিলেন। তিনি একদিন কেদারপুরে ঘর জ্বালানী দেখিয়া এক হাঁক দেন। এই অপরাধে কুঠীর লাঠিয়ালগণ আমাদিগকে লাঠি ও বর্শা দ্বারা আঘাত করে এবং অজ্ঞান অবস্থায় হাতীর উপরে আমাদিগকে চড়াইয়া রতনপুরে লইয়া যায় এবং এক ঘণ্টা পরে সেই স্থান হইতে যাদবপুরে লইয়া যায়। চৈত্র মাসে আমাদিগকে প্রথমে ঐরূপে ধরিয়া লইয়া যায়, কিন্তু তাহার তারিখ মনে নাই। যাদবপুর হইতে রাত্রিযোগে আর এক কুঠীতে চালান দেয়। তাহারা সকল স্থানেই আমাদিগকে গুদামে পুরিয়া রাখে। শ্রাবণ মাসের শেষে আমাদিগকে ছাড়িয়া দেয়। তাহারা প্রথমে আমাদিগকে নালিস করিতে নিষেধ করে. ও বলে যে তোমাদের জমী ও মাহিয়ানা ফেরত দিব, কিন্তু শেষে দেয় নাই। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে নালিস করিলে তাহারা আমাদিগকে রাজিনামা দেওয়ায়।

হরিশ এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতি সপ্তাহে হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিতে লাগিলেন। কি উপায়ে এই সকল অত্যাচার বন্ধ হইবে তাহার প্রস্তাব সকল করিতে লাগিলেন। যতদিন ছার ফ্রেডারিক হালিডে বঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, ততদিন এই অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি হইয়াছিল। হালিডে সাহেব নীলকরদিগের পক্ষপাতী ছিলেন, কাজে কাজেই প্রজার দুঃখের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ১৮৬০ সালে জে পি গ্রাণ্ট সাহেব বঙ্গের দ্বিতীয় ছোটলাট হইলে এই নীল বিদ্রোহের অত্যাচার সকল দমন হইবার আশা সঞ্চার হইল। তিনি নীল চাষে যে অনেক অত্যাচার আছে, তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিলেন এবং ১৮৬০ সালের ১১ আইন ।৩৯। বিধিবদ্ধ হইল। এই

আইন অনুসারে নীল চাষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক কমিসন বসিল। হরিশ এই কমিসনের সমক্ষে যে জবানবন্দী দিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে পাঠক জানিতে পারিবেন যে লক্ষ লক্ষ প্রজার হিতের জন্য তিনি কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদের বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। জবানবন্দী নিম্নে অনুবাদ করা গেল।

ইণ্ডিগো কমিসনের নিকট হরিশের জবানবন্দী

৩০শে জুলাই ১৮৬০ সাল

ডভলিউ, এছ, সিটন্‌কার ছি, এছ সাহেব সভাপতি।

সভ্য

আর, টেম্পল, ছি, এছ।

ডভলিউ এফ, ফার্গুছন।

রেভারেণ্ড জে, সেল।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

উক্ত সভ্যগণের মধ্যে সিটনকার ও টেম্পল মহোদয়গণ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, ফার্গুসন সাহেব নীলকরের প্রতিনিধি, ও রেভারেণ্ড সেল সাহেব মিসনারীগণের প্রতিনিধি, ও চন্দ্রমোহন বাবু জমীদার ও প্রজার প্রতিনিধি ছিলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র হাজির হইয়া শপথ করিয়া বলিলেন।

সভাপতির প্রশ্ন। আপনি কি কাজ করেন?

উ। আমি মিলিটারী অডিটর জেনরেলের আফিসে গবর্ণমেণ্টের একজন কর্ম্মচারী।

সভাপতি। আপনি কি হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক ?

উ। ঐ কাগজের দায়ী (Responsible) সম্পাদক বলিয়া আমি স্বীকার করি না, কিন্তু উহার স্বত্বাধিকারীর উপরে আমার প্রচুর ক্ষমতা থাকায় আমি তাঁহাকে ঐ কাগজের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমার যাহা ন্যায় বোধ হয় তাহা তাঁহাকে গ্রহণ করাইতে পারি।

সভা। আপনি বিশেষ যত্নের সহিত নীল হাঙ্গামার বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার কি সুবিধা পান নাই ?

উ। হাঁ, পাইয়াছিলাম। ।৪০।

সভা। নীল হাঙ্গামার সময় প্রজাগণ কিম্বা অন্য কোন পক্ষ আপনার নিকট কি পরামর্শ চাহেন নাই ?

উ। হাঁ, অনেক জমীদার, প্রজা ও মধ্যবর্ত্তী ভূম্যধিকারীগণ অনেক জেলা হইতে আমার নিকটে আসিয়া উপদেশ চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার নিকট স্বয়ং আসিয়াছিলেন।

সভা। কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে তাঁহারা সাধারণত আপনার উপদেশ চাহিয়াছিলেন ?

উ। নীল চাষের সরাসরি বিচার ও দাদন চুক্তিভঙ্গ সম্বন্ধে ১৮৬০ সালে ১১ আইন জারী হইবার পূর্ব্বে অনেক প্রজা নীল বপন করিতে কিসে না হয় তাহার সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। পরে ঐ আইন জারী হইলে তাহারা কিরূপে জবর্দ্দস্তি ও অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে তাহার সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিল। নীলের দাদন কিসে না লইতে হয় তদ্বিষয়েও পরামর্শ চাহিয়াছিল।

এ সকল ব্যতীত, আমি অনেক সময়ে, তাঁহাদের জন্য দরখাস্ত লিখিয়া ও অন্যান্য পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলাম।

সভা। পূর্ব্বোক্ত বিষয় সম্বন্ধে আপনি মোটামুটি কি কি উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা কি বলিতে পারেন?

উ। আমি সচরাচর তাঁহাদিগকে জেলার প্রধান কর্ম্মচারীদিগের নিকট যথানিয়মে, তাহাদের ক্লেশ নিবারণের জন্য দরখাস্ত করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। যদি তাহারা সেখানে অকৃতকার্য্য হয়, তবে জেলার রাজকর্ম্মচারীদিগের উপর আওলার (যেমন কমিসনার ও ছোটলাট) নিকট তাহাদের ক্লেশ জানাইতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। আমি তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম যে, তাহারা কখন কোন হাঙ্গামা কিম্বা আইনবিরুদ্ধ কাজে প্রবৃত্ত না হয়। আমি তাহাদিগকে আরও বুঝাইয়াছিলাম যে উক্ত ১১ আইন অল্পকালের জন্য বাহাল থাকিবে; এবং ভবিষ্যতে ভাল আইন হইবার সম্ভাবনা আছে। যদি ঐরূপ হয়, তাহা হইলে তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক দাদন লইতে পারিবে। আমি তাহাদিগকে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দামা করিতে পরামর্শ দি। দেওয়ানী আদালতে প্রজাদিগের যত যাওয়া উচিত ছিল তত তাহারা যায় নাই। ক্ষতিপূরণের জন্য যে আইন হয়, আমি তাহারই কথা বলিতেছি। ।৪১।

সভা। আপনি ইংরাজী কাগজের সম্পাদক ও আপনার কাগজ সম্ভবত সাহেবেরা পাঠ করেন। এমন অবস্থায় আপনি মফস্বলের কোন লোকের নিকট হইতে পত্রাদি পাইয়াছিলেন কি না এবং তাঁহারা আপনার উপদেশ চাহিয়াছিলেন কি না?

উ। হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদকের নামে যে সকল চিঠি আসিত

আমি তাহা খুলিতাম ও পড়িতাম, এবং উহার মধ্যে অনেক চিঠি ও কাগজে অত্যাচার সম্বন্ধে ও আমার উপদেশ গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা থাকিত।

সভা। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত খবরের কাগজের (যথা ভাস্করের) অপেক্ষা ঐরূপ চিঠিপত্র হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদকের নামে বেশী আসিবার সম্ভাবনা ছিল কি না?

উ। সম্ভবত বেশী আসিত।

সভা। যশোহর, কৃষ্ণনগর ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি নীলের জায়গায় আপনি কখন স্বয়ং গিয়াছিলেন কি না, এবং ঐ সকল স্থানের অধিবাসীর সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় আছে কি না?

উ। বারাসত ও হুগলী ব্যতীত আমি উক্ত জেলায় কখন যাই নাই। নদীয়া জেলার অনেক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে এবং রাজসাহী ও ময়মনসিংহের কতক কতক লোকের সঙ্গে জানাশুনা আছে। ঐ সকল লোক আমার সহিত ভবানীপুরে আসিয়া আলাপ করিয়াছিলেন।

সভা। নীল হাঙ্গামার সময় ঐ সকল জেলার অবস্থা জানিবার জন্য আপনি লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন কি না?

উ। কেবলই খবরের জন্য নহে। মোক্তার ও উকীলদিগকে প্রজাপক্ষ হইয়া মোকদ্দামা চালাইবার জন্য আমি অনুরোধ করি এবং ঐ সকল আইনব্যবসায়ীরা হিন্দুপেট্রিয়টের সংবাদদাতা হয়েন। আমি সময়ে সময়ে ঐ সকল জেলার লোকদিগের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সকল ঘটনা ও মোকদ্দামার সংবাদ পাইতাম।

মেঃ ফার্গুসন। আপনি কলিকাতা হইতে মোক্তার কিম্বা অন্য

আইনব্যবসায়ী এজেন্ট পাঠাইয়াছিলেন কি না, এবং রাইয়তদিগকে ঐ সকল এজেন্টকে নিযুক্ত করিতে বলিয়াছিলেন কি না ?

উ। রাইয়তেরা কলিকাতা হইতে তাহাদিগকে লইয়া যায়। আমি ।৪২। কেবল একজন প্রজার জন্য মোক্তারদিগের পুরস্কার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া দিয়াছিলাম। জিতুবাড়ুর্য্যে নামক দামুড়হুদা সবডিবিজনের মোক্তার যখন রাইয়তদিগকে নীলকরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন বলিয়া অপবাদ দিয়া কারারুদ্ধ হয়েন, তখন কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমার মোক্তারগণ ব্যতীত অন্য মোক্তারগণ ভয়ে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিতে অস্বীকার করিলে আমি ঐরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম।

সভা। তবে আপনি একথা স্পষ্ট বলিতেছেন যে আপনি কখন থানা বর থানা, কিম্বা গ্রামে গ্রামে প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিবার মানসে দূত প্রেরণ করেন নাই।

উ। না, আমি কখনই ঐরূপ কার্য্য করি নাই। এই কথা অস্বীকার করিবার যে আমায় সুযোগ প্রদান করিলেন, তাহার জন্য এই সভাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

রেভারেণ্ড সেল। আপনার জ্ঞানানুসারে কয়জন মোক্তার কলিকাতা হইতে কোন কোন নীল হাঙ্গামার জায়গায় গিয়াছিল, এবং তাঁহাদের সহিত আপনার কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল ?

উ। তিনজন মাত্র মোক্তার নদীয়া জেলায় গিয়াছিল। তাঁহাদের সহিত আমার এই কথাবার্ত্তা হইয়াছিল যে তাঁহারা মেহনতআনা পাইলে প্রজার পক্ষ হইয়া মোকদ্দামা চালাইবেন।

মেঃ ফার্গুসন। আপনি নীলের সম্বন্ধে সারকুলার নোটিস প্রস্তুত

করিয়া তাহা প্রজাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছেন এই যে জনরব শুনা যায় তাহা সত্য কি না?

উ। আমি ঐ সকল বিষয় কিছুই জানি না ও উক্ত সারকুলার চক্ষে দেখি নাই।

রেভারেণ্ড সেল। সরাসরি আইন (১১ আইন) জারী হইলে আপনি বলিয়াছেন যে প্রজারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে তাহারা কিরূপে জবর্দ্দস্তির হাত হইতে রক্ষা পাইবে। তাহারা উক্ত আইনের কার্য্য কিরূপে একেবারে রহিত হইতে পারে তাহার সম্বন্ধে আপনার মত কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল? না, ঐ আইনের অছিলা করিয়া, রাজকর্ম্মচারীরা ও নীলকরেরা যে সকল অত্যাচার করিতেন তাহার সম্বন্ধে আপনার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? ।৪৩।

উ। প্রজারা উক্ত আইন কার্য্যে যাহাতে পরিণত না হইতে পারে তৎসম্বন্ধে পরামর্শ চাহিয়াছিল। ঐ আইনের অছিলা করিয়া রাজকর্ম্মচারী ও নীলকরগণ যে ঘোর অত্যাচার করিতেন তৎসম্বন্ধে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

রেভারেণ্ড সেল। কি রকম অত্যাচার হইত আপনি কি বলিতে পারেন?

উ। সেঁতা, ছোট ও সঙ্কীর্ণ গুদামে অনেক লোক কয়েদ করিয়া রাখা, বলপূর্ব্বক সম্পত্তি লুণ্ঠন, ও নীলকর দ্বারা উত্তেজিত হইয়া পুলিশের কর্ম্মচারী দ্বারা প্রজাদিগের স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার প্রভৃতির কথা বলিতেছিলাম।

মেঃ ফার্গুসন। আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন যে এই সকল অত্যাচার ১৮৬০ সালের ১১ আইনের জন্য হইয়াছে?

উ। হাঁ আমি বিশ্বাস করি। গুদামে বদ্ধ করিয়া রাখার বিশ্বাস অনুসন্ধান দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ইহা আদালতের বিচার দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে।

সভা। আপনি কি জানেন যে এই ১১ আইন জারী হওয়ার পর বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট উক্ত অত্যাচার নিবারণ মানসে স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন ?

উ। ঐ আইন জারি হওয়ার ২।৩ মাস পর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের তদারক ভাল হয় নাই। ঐ কয়েক মাসের পর তদারক ভাল হইয়াছিল।

বাবু চন্দ্রমোহন। কমিসনের সমক্ষে লারমুর সাহেব জবানবন্দী দেন যে ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হালিডে বাহাদুর নীলকরদিগের মধ্যে কোন কোন সাহেবকে অনরারী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া নীলকরদিগের প্রতি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভ্যদিগের হিংসা হইয়াছে। আপনি ঐ সভার সভ্য হইয়া ঐ বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন কি ?

উ। লারমুর সায়েবের কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় নানা প্রকার রাজনীতি মতধারী সভ্য আছেন। কেহ বা নীলকরের মিত্র, কেহবা শত্রু। উক্ত সভা হইতে ছোটলাটের নিকট ১৮৫৭।৫৮ সালে ২৯ আগষ্ট তারিখে অনরারী মাজিষ্ট্রেটের নিয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া এক দরখাস্ত করা হয়। তাহার এক খণ্ড নকল আমি দাখিল করিলাম।

সভা। নীলের সম্বন্ধে আধুনিক তর্কবিতর্ক সময়ে, আপনি কি ইহা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছিলেন যে, বহুসংখ্যক প্রজার হিতাহিত যে

সকল প্রশ্নের উপর নির্ভর করে, তাহার বিষয় স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া, মত সকল ব্যক্ত করা উচিত।

উ। আমি এই নীল হাঙ্গামার বিষয় বিশেষ যত্ন ও সাবধানে পর্য্যালোচনা করিয়াছি, এবং ইহা আমার নিঃসন্দেহ বিশ্বাস যে বর্ত্তমান নীলচাষ প্রজার অহিতকারী, এবং আমি এই মত সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছি। ভবিষ্যতে নীলকর ও প্রজার মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপন হইবে এই বিষয়ে আমার কেবল এক মাত্র সন্দেহ আছে।

প্রজার পক্ষ হইয়া যে তিনি কেবল দরখাস্তাদি লিখিয়া ক্ষান্ত হইতেন এমন নহে। শত শত প্রজা মফস্বল হইতে কলিকাতা লাট সাহেবের কাছে তাহাদের দুঃখ জানাইতে আসিলে হরিশ নিজ ব্যয়ে তাহাদিগকে আহার ও বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। ভবানীপুর দরিদ্র প্রজার আশ্রয়স্থান হইয়াছিল। মফস্বল হইতে নিষ্পীড়িত প্রজারা দলে দলে রথযাত্রীর লোকের ন্যায় ভবানীপুরে আসিয়া হরিশের আশ্রয় লইল। হরিশের অবস্থা সঙ্কীর্ণ হইলেও তিনি তুলনারহিত উদারতা ও নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়া ধারকর্জ্জ করিয়া প্রজাদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে তিনি যেমন জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, নীল বিদ্রোহেও তিনি সেইরূপ বঙ্গীয় নিঃসহায় কৃষকদিগের উপকার

করিয়াছিলেন। নিঃস্বার্থ পরোপকার তাঁহার জীবনের প্রধান মন্ত্র ছিল। এই মন্ত্র সাধন ও কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া তাঁহার কঠোর অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, এই অপরিমিত পরিশ্রমই তাঁহার অকাল মৃত্যুর এক কারণ। নিজের অপকার করিয়া পরের উপকার করা উনবিংশ শতাব্দীতে বড়ই কম। কিন্তু হরিশ নিজের উপার্জ্জন, নিজের ও কিম্বা আত্মীয়স্বজনের বিলাসে কিম্বা সুখস্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত না ব্যয় করিয়া, সেই টাকায় বঙ্গের কৃষকসমাজের উপকার করিয়াছিলেন।।৪৫। ইহার অপেক্ষা সৎ দৃষ্টান্ত মনুষ্যজীবনে আর কি হইতে পারে। উইলবার ফোর্স ও তাঁহার সহকারীগণ দাস-প্রথা রহিত করিবার জন্য বিলাতে যে মহৎ স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তদনুরূপ হরিশ, নিঃসহায়, দরিদ্র মূর্খ লক্ষ লক্ষ প্রজার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

হরিশের মৃত্যু

এই জবানবন্দী দেওয়ার পর হরিশ কেবল এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। ১৮৬১ সালের ১৪ই জুন শুক্রবার ৯॥০ টার সময় হরিশ ৩৮ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ সোম বলেন যে হরিশের বহুদিন হইতে অল্প অল্প কাশির ব্যায়ারাম ছিল। কঠোর পরিশ্রম ও অন্যান্য কারণে হরিশের ক্ষয়কাশ জন্মায়। কালীচরণ বাবু এখনও জীবিত আছেন। ইনি হরিশের আফিসে একত্রে চাকরী করিতেন। ইনি

বলেন হরিশের গলায় একটি মাতুলী ছিল। হাঁপানির ব্যায়ারাম জন্য তাঁহার মাতার অনুরোধে এই মাতুলী ধারণ করিয়াছিলেন। পীড়িতাবস্থায় ডাক্তার এডওয়ার্ড গুডিভ ও নীলমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁহার চিকিৎসা করেন। ৺রমাপ্রসাদ রায় তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি হরিশকে চিকিৎসার জন্য আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থিত নিজ ভবনে আনিয়া রাখেন। মৃত্যুর দুই একদিন পূর্ব্বে ডাক্তার মহাশয়েরা তাঁহার জীবনে আর আশা নাই এই কথা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে ভবানীপুরের চাউলপটীর বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি সেই স্থানেই বৃদ্ধ মাতা, স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাণকে রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বঙ্গের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ৺দীনবন্ধু মিত্র লিখিত নীলদর্পণ নাটক ইংরাজীতে অনুবাদ করার অপরাধে প্রাতঃস্মরণীয় রেভারেণ্ড লংসাহেবের কারাদণ্ড হয়। এই দুই শোচনীয় ঘটনার উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত কবিতা পংক্তিদ্বয় লিখিত হয়—

"অসময়ে হরিশ মলো লংয়ের হলো কারাগার—
নীলবাঁদরে সোনার বাঙ্গলা কর্‌লো ছার খার।"

১৮৬১ সালে ১২ই জুলাই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের গৃহে তাঁহার স্মরণার্থ একটি সভা হয়। ৺রমানাথ ঠাকুর ঐ সভার সভাপতি হয়েন। ।৪৬। ৺বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাব করেন—

"হরিশের অকাল ও খেদজনক মৃত্যুতে বঙ্গীয় সমাজের বিশেষ ক্ষতি বোধে এই সভার সভ্যেরা অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে তাঁহার জন্য আক্ষেপ করিতেছেন। হরিশ্চন্দ্র এই দেশের মঙ্গলের জন্য যে তাঁহার

সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাও স্বীকার করিতেছেন।”

রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। ৺কিশোরীচাঁদ মিত্র দ্বিতীয় প্রস্তাব করেন ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহার সমর্থন করেন—

“হরিশের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা কমিটির ইচ্ছানুসারে কোন স্কুলে তাঁহার নামে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া যাইবে, কিম্বা উক্ত কমিটির ইচ্ছা হইলে অন্য প্রকার স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন করা যাইবে।”

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কমিটি নিযুক্ত হন। ৺কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, ৺প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ৺সত্যচরণ ঘোষাল, ৺রমানাথ ঠাকুর, ৺রামগোপাল ঘোষ, ৺হরচন্দ্র ঘোষ, ৺দিগম্বর মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺শম্ভুনাথ পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৺পিয়ারীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যাদবকৃষ্ণ সিংহ, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৺কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, ৺চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নওয়াব আবদুল লতীফ, ৺কৃষ্ণদাস পাল সেক্রেটরি।

এই সভায় যে সকল বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ রিপোর্ট কোন স্থানে পাওয়া যায় না বলিয়া বক্তাদিগের বক্তৃতা এ স্থানে দিতে পারিলাম না। প্রসিদ্ধ বারিষ্টার মনট্রিও সাহেব হরিশের সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তাহারও রিপোর্ট কোন স্থানে নাই। মনট্রিও সাহেব হরিশকে ইউরোপীয় লোকের ন্যায় অসীম ক্ষমতা ও নানা

সংগুণে গুণী ছিলেন বলিয়া বহুল প্রশংসা করেন। বাস্তবিক হরিশ যদি বিলাতে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে হয়ত তিনি পার্লামেণ্ট সভার অধিনায়ক হইতে পারিতেন। নবাব আবদুল লতীফ হরিশের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তৃতীয় প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। তিনি বলেন হরিশ যে কেবল হিন্দুহিতৈষী ছিলেন।৪৭। তাহা নহে, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার আদরের পাত্র ছিল। তিনি সমস্ত মানব জাতির প্রকৃত বন্ধু ছিলেন।

হরিশের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য কৃষ্ণনগরে এক সভা হয়। উক্ত সভায় ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় এক বক্তৃতা করেন এবং কৃষ্ণনগর হইতে অনেক চাঁদা সংগৃহীত হয়। মেদিনীপুরেও ঐরূপ একটি সভা হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু এক বক্তৃতা করেন। জঙ্গীপুরে চুচুড়ার শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় সেই সময়ে মুন্সেফ ছিলেন। হরিশের স্মরণার্থ সেখানেও একটি সভা হয় এবং উক্ত সভায় গঙ্গাচরণ বাবু একটি বক্তৃতা করেন।

এদেশে সচরাচর যেরূপ সকল সৎকার্য্যের প্রস্তাব কথায় ও বক্তৃতায় শেষ হয়, হরিশের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল। বাঙ্গালীরা "মরা গরুর ঘাস কাটিতে" নিতান্তই অনিচ্ছুক। সুতরাং তাঁহারা হরিশের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য উপযুক্তরূপ কোন চেষ্টাই করেন নাই। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই বিশেষ উদ্যোগ করা হইল না। পরে ১৮৭৬ খৃঃ ১৫ই জুলাই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় পণ্ডিতবর বাগ্মী ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এক বক্তৃতা করিয়া বলেন যে হরিশের স্মরণার্থ সর্ব্বসাকুল্যে ১০৫০০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। এই টাকা দ্বারা বাদুড়বাগানে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের প্রদত্ত

জমীতে হরিশের নামে অট্টালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব। হরিশের চেহারা না থাকায় তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপনও অসম্ভব। কমিটির মতে তাঁহার নামে ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি দেওয়া ভাল বোধ হয় না। অতএব তাঁহার নামে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা গৃহে একটি পুস্তকালয় সংস্থাপন করা ভাল। উক্ত ১০৫০০ টাকা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার গৃহ ক্রয় করিবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছিল।

ফল কথা এই হরিশের সম্মানের জন্য তৎকালীন কোন শ্রেণীর লোক বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। "রাইজ ও রায়তে"র বর্ত্তমান সম্পাদক বাবু শম্ভুনাথ [চন্দ্র] মুখোপাধ্যায় বলেন যে সেই সময়ে কোন এক প্রসিদ্ধ জমীদার হরিশের স্মরণচিহ্ন সম্বন্ধে এই বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে "গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে হরিশের জন্য যদি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত হয় তবে রাজরাজড়ারা মরিলে কি হইবে।" ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে সেই সময়ে হরিশের সম্মানার্থ কি বড় মানুষ কি মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর।৪৮। লোকেরা বিশেষ চেষ্টা ও আন্তরিক যত্ন দেখান নাই। ৺কৃষ্ণদাস পালের স্মরণচিহ্ন যে কারণে হইতেছে না সেই কারণে হরিশেরও হয় নাই। আমাদের দেশের লোকেরা জীবিতাবস্থায় বড় লোকের সম্মান ও খোসামোদ করেন, মরণান্তে তাঁহাদিগের নাম বিস্মরণ হন। মৃত সিংহের অপেক্ষা জিয়ন্ত শৃগালের আদর আমাদের দেশে বেশী। ইহা ঘোর জাতীয় কলঙ্কের কথা। আশা করি বঙ্গবাসী এই কলঙ্ক কার্য্য দ্বারা অপনোদন করিবেন।

হরিশের সম্বন্ধে নানা গল্প

শ্রদ্ধাস্পদ ধার্ম্মিক প্রবর শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয় আমাদিগকে বলেন যে, একদা বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের বাটীতে হরিশের নিমন্ত্রণ হয়। তথায় প্যারীচাঁদ মিত্র ও তাঁহার ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অন্যান্য ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। হরিশকে রামগোপাল বড় স্নেহ ও আদর করিতেন। এই সময়ে হরিশ অত্যন্ত সুরাপানে আসক্ত হইয়াছিলেন। এই কথা রামগোপাল জানিতে পারিয়া হরিশকে সকলের সমক্ষে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন যে তোমার জীবন বড় মূল্যবান, তুমি এরূপ সুরাসক্ত হইলে আর অধিক দিন বাঁচিবে না। হরিশ রামগোপালকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করতেন। তিনি এই ভৎর্সনা বাক্যে অসন্তুষ্ট না হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে আপনাকে আমি বড় ভাইয়ের ন্যায় মান্য করি; আপনি আমার দোষের কথা না বলিলে আর কে বলিবে। কথা প্রসঙ্গে রামগোপাল বাবু হরিশকে বলিলেন যে এই মজলিসে এমন একজন লোক আছেন যে তাঁহার চরণামৃত খাওয়া যাইতে পারে। তিনি রামতনু বাবু।

কৃষ্ণনগর কলেজের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরিতারণ ভট্টাচার্য্য বলেন যে একদা কোন এক বাগানবাটীতে প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন যে মেকলের লেখার পারিপাট্য বড় সুন্দর। হরিশ বলেন যে গিবনের লেখা মেকলের অপেক্ষা আরও সুন্দর। হরিশ আপন মত সমর্থনার্থে গিবনের সমস্ত ইতিহাস মুখস্থ এত অনর্গল বলিতে লাগিলেন, যে সকলেই অবাক হইয়া রহিলেন। ।৪৯।

চুঁচুড়ার শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সরকার বলেন যে হরিশ অতি অল্প

সময়ের মধ্যে স্নান ও আহারাদি কার্য্য সারিতেন। ৮।১০ মিনিটের মধ্যে তাঁহার স্নান ও আহারাদি হইত। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একথা স্বীকার করিয়া বলেন যে হরিশের সহিত একত্রে আহার করিতে বসিয়া তিনি বড় অপ্রস্তুত হইতেন। শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব জজ) বলেন যে, যে সময়ে লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যা রাজ্য খাস করিয়া লয়েন, তখন হরিশ ইহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। লর্ড ডালহৌসী হরিশের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সার ফ্রেডারিক হালিডেকে (বঙ্গের লাট সাহেব) অনুরোধ করেন যে হরিশকে কোন উচ্চতর পদ প্রদান করিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করা ভাল।

বাবু কালীচরণ সোম বলেন যে পারিবারিক সুখে হরিশ অনেক পরিমাণে বঞ্চিত ছিলেন। সময়ে সময়ে বাটীতে তাঁহার মাতা ও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত কথান্তর হইত। তাঁহার জননী আদপাগ্‌লা স্ত্রীলোক ছিলেন, অল্প কথাতেই রাগ করিয়া হাড়িকুঁড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। হরিশের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার মনের শান্তি নষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিবাহ মাতার ইচ্ছানুসারে ভাল ঘরে ও ভাল কন্যার সহিত হয় নাই। সুতরাং এই সকল কারণে তিনি পারিবারিক সুখ হইতে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কালীচরণ বাবু বলেন যে সময়ে সময়ে হরিশ পরিবারস্থ ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট হইয়া কলিকাতার ভাড়াটিয়া বাটীতে থাকিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে থাকিতে হইলে উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির যে সহিষ্ণুতা ও নিঃস্বার্থপরতা গুণ দেখাইতে হয় হরিশ তাহা দেখাইয়াছিলেন। হরিশের নিজের খাওয়া পরার বিষয়ে কিছুই

আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু নিজ সহোদর ভ্রাতা হারাণ বাবুকে তিনি বাবুগিরি চালে চলিতে দিতেন। মাতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ ও ভক্তি ছিল। সময়ে সময়ে তাঁহার অনুরোধে আপন বাটীতে দুর্গাপূজা করিতেন। ১৮৬১ খৃঃ হরিশ অত্যন্ত পীড়িত হইলে তিনি প্রতিদিন, কাতর ও ক্ষীণ শরীরে, আফিসে যাইয়া কর্ম্ম করিতেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ হরিশের স্মরণার্থ সভায় বক্তৃতার সময় বলেন যে মৃত্যুকালে হরিশ বলিয়াছিলেন, যে "বাঙ্গালী আপন জীবন উৎসর্গ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিতে পারে এই দৃষ্টান্ত ইংরাজদিগকে দেখাইবার জন্য তিনি অত্যন্ত পীড়ার সময়েও ছুটি লইবার জন্য প্রয়াস ।৫০। পান পাই।" মনট্রিও সাহেব উক্ত সভায় বলেন যে একদা হরিশকে একটি উচ্চপদ দিবার প্রস্তাব হয়। উহাতে মনট্রিও সাহেব হরিশকে বলেন যে "রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিত্বপদ পাইলেও, তুমি নিজে যে রাজ্য (অর্থাৎ পেট্রিয়ট) সৃষ্টি করিয়াছ তাহা তোমার ত্যাগ করা উচিত নহে।"

মনট্রিওর কথানুসারে তিনি দুই একদিন এ বিষয় ভাবিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে মহাশয়ের কথা আমি গ্রাহ্য করি, আমি পেট্রিয়ট পরিত্যাগ করিব না। বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ হরিশের স্মরণার্থ সভায় যে বক্তৃতা করেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করা গেল।

হরিশের সহিত তাঁহার প্রায় ১০ বৎসর আলাপ হইয়াছিল। প্রথম আলাপের সময় তিনি হরিশকে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভার কার্য্য পরিত্যাগ করিলে হরিশ তাঁহার স্থলবর্ত্তী হইয়া উক্ত সভার দরখাস্তাদি লেখা ও অন্যান্য কার্য্য কঠোর

পরিশ্রমে ও বিশেষ পারদর্শিতার সহিত সম্পন্ন করিতেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ ও এদেশীয়দিগের মধ্যে ঘোর মনান্তর জন্মিয়াছিল। তিনি এই সময়ে বিদ্রোহ শান্তি ও ইংরাজ রাজার প্রতি জনসাধারণের ভক্তি যাহাতে অচল থাকে তাহার জন্য লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে। যে কোন দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট দুঃখ জানাইত হরিশ তাহাকে অর্থ দ্বারা হউক, কিম্বা অন্য উপায়ে সাহায্য করিতেন। দরিদ্রের জন্য দরখাস্ত লেখা ও দরিদ্রের হইয়া বড় মানুষদিগের বাটী গিয়া সাহায্য যাচ্ঞা করায় তাঁহার সমস্ত সময় ক্ষেপণ হইত।

"একদা বিলাতে এদেশীয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ হরিশকে পাঠাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। হরিশের ইচ্ছা থাকিলেও সামাজিক প্রথা ও বন্ধনবশত বিলাত যাইতে পারেন নাই। যদিও তিনি ব্যবসায়ী উকীল ছিলেন না তথাপি তিনি ওকালতী করিলে হাইকোর্টের একজন প্রধান উকীল হইতে পারিতেন। একদা তিনি হরিশকে ওকালতী কিম্বা বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বলেন। তিনি তদুত্তরে বলেন যে কর্ণেল চ্যাম্পনিজ তাহার এত উপকার করিয়াছেন যে তিনি চাকরী পরিত্যাগ করিবেন না। ওকালতী কিম্বা ব্যবসায়ী হইলে তাঁহার সময় ঐ সকল কার্য্যে ক্ষেপণ করিতে হইবে। আমার ধন নাই, সুতরাং ধন দ্বারা দরিদ্রের উপকার করিতে ।৫১। পারি না, কিন্তু আমার সময় ও পরিশ্রম দ্বারা তাহাদের উপকার সাধন করিতে পারি।"

রামগোপাল বাবু উক্ত বক্তৃতায় বলেন যে ১৮৫৩ খৃঃ যখন ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চার্টার পুনঃপ্রদত্ত হয়, তখন এদেশীয়েরা উহাতে আপত্তি করেন। কলিকাতা হইতে পার্লামেণ্ট সভায় এক আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়। ঐ পত্র হরিশের "স্বহস্ত রচিত"। হরিশ হিন্দুপেট্রিয়টে কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারাণী স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করা ভাল ইহা দেখাইবার জন্য যে সকল প্রবন্ধ লেখেন তাহা এখন আর পাওয়া যায় না। এই সকল প্রবন্ধ ও আবেদনপত্র এত বিশদরূপে লিখিত হইয়াছিল যে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ব্রাহ্মসমাজ ও হরিশ্চন্দ্র

হরিশ্চন্দ্র এক ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ ছিলেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে তিনি অনেকবার বক্তৃতা করেন। তিনি মুখে মুখে বক্তৃতা করিতে পারিতেন কিনা তাহা আমরা জানি না। যাহা তাঁহার বক্তব্য ছিল তাহা লিখিত হইয়া পাঠ করা হইত। ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে উক্ত সমাজে তিনি "ব্রাহ্মসমাজ, উহার বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ আশা" (Brahma Somaj, its position and prospect) এই সম্বন্ধে এক লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে ১৬ই জানুয়ারী ১৮৫৬ সালে "ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মবিশ্বাস" (Positive theology of the Brahma Somaj) সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। পুনর্ব্বার ১৮৫৭ খৃঃ সাধারণে একত্রে ঈশ্বর আরাধনায় উপকারিতা

(On the Utility of public worship) সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বাবু ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সকল বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবেন। তিনি বলেন যে ভগবৎগীতা সম্বন্ধে হরিশ এক প্রবন্ধ লেখেন, কিন্তু তাহা এখন আর কোন স্থানে পাওয়া যায় না। এই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিলে জানা যায় যে হরিশ পাশ্চাত্ত্য ধর্ম্ম ও দর্শন-শাস্ত্র ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। ।৫২। তিনি ব্রাহ্মসমাজাদি স্থাপন করিলেও প্রতিমা পূজা পদ্ধতি ত্যাজ্য মনে করিতেন না, পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে তিনি আপন বাটীতে দুর্গোৎসব করিতেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা ও হরিশ্চন্দ্র

১৮৫২ খৃঃ আগষ্ট মাসে হরিশ্চন্দ্র উক্ত সভার সভ্য হয়েন। এই সভা ১৮৫১ খৃঃ ২৯শে অক্টোবর সংস্থাপিত হয়। হরিশ এই সভার সভ্য হইয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরব সাধনে বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন দেখাইয়াছিলেন। এই সভা হইতে দেশের মঙ্গল কামনায় সময়ে সময়ে পার্লামেণ্টে সভায় ও বড়লাটের নিকট ইংরাজী দরখাস্তাদি পাঠান হইত ; হরিশ এই সকল দরখাস্ত লিখিতে সাহায্য করিতেন। মিলিটারী আফিসে চাকরী করিয়া তিনি প্রতিদিন ৫ টার পর উক্ত সভায় আসিয়া উহার কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সঙ্গে আইন জ্ঞানে সমকক্ষ হইবেন বলিয়া তিনি রেগুলেসন আইন সকল উত্তম করিয়া পাঠ করেন। হরিশের বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া ঐ সভার বড় বড় সভ্যেরা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা

করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত সভা হইতে তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধের ব্যয় প্রদান করা হয়। নীলকুঠীয়ালেরা তাঁহার নামে হুরমুত খাহারের নালিস করিলে তাঁহার মৃত্যুর পর এক তর্ফা ডিক্রি হয়। কথিত আছে যে তাঁহার বাটী উক্ত মোকদ্দামার ঋণবশতঃ ক্রোক্ হইয়াছিল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বলেন, ঐ ক্রোক্ খালাস করিবার জন্য উক্ত সভার সভ্যেরা টাকা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য মাসিক ১০ টাকা দেওয়া হয়।

হরিশ অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন। তাঁহার লিখিত হিন্দুপেট্রিয়টে জানা যায় যে, সময়ে সময়ে ইংরাজ সম্পাদকগণের সঙ্গে তর্কবিতর্কে তিনি অল্প কথায় তাঁহাদের বিদ্রূপ করিয়া তর্কস্থলে জয়লাভ করিতেন। শম্ভুবাবু বলেন হরিশ অত্যন্ত তামাক-প্রিয় ছিলেন। তিনি যাত্রাদি গান শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। নটের অপেক্ষা নটীর ক্রীড়ায় বেশী আমোদ বোধ করিতেন। ।৫৩।

হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বৈর নির্যাতন

নীল বিদ্রোহের সময় প্রজার অত্যাচার নিবারণ মানসে হরিশ বদ্ধপরিকর হইলে, নদীয়া জেলার নীলকরগণ তাঁহাকে কেহ বা গুলি করিব, কেহ বা অন্তরালে থাকিয়া মারিব বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। হরিশ দুর্দ্দমনীয় সাহসে এই সকল ভয়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া প্রজার পক্ষে লিখিতে থাকিলেন। এই সময়ে ঢাকা জেলার বাবু গিরীশচন্দ্র বসু কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমার দারোগা ছিলেন। তিনি "চাষা" এই নাম ধরিয়া হিন্দুপেট্রিয়টে নীলকরের অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে প্রসিদ্ধ বারিষ্টার মনমোহন ঘোষ হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিতে আরম্ভ করেন। নীলকরেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া হরিশের নামে লাই-বেলের মোকদ্দামা আনিলেন। ১৮৬০ খৃঃ ৩রা মার্চ্চের হিন্দুপেট্রিয়ট পাঠে জানা যায় যে নিশ্চিন্দিপুরের আর্চিবলড হিলস সাহেব সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দামা আনেন। সেইখানে উক্ত মোকদ্দামা না চলায় পুনর্ব্বার সেপ্টেম্বর মাসে জর্জ্জ মিয়ার্শ সাহেব ২৪ পরগণার সবজজের কোর্টে ১০০০০ হাজার টাকার দাবী দিয়া হুরমুত বাহারের মোকদ্দামা আনেন। হরমণি দাসীকে নীলকরেরা জোর করিয়া গৃহ হইতে কাড়িয়া লইয়া যান বলিয়া হিন্দুপেট্রিয়টের নামে এই নালিশ উপস্থিত হয়। এই মোকদ্দামা চলিতে চলিতে হরিশের মৃত্যু হয়। ইহাতে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় তাহার জন্য তাঁহার বাটী ঋণে বদ্ধ হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বলেন যে এই ঋণ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভ্যেরা পরিশোধ করিয়া বাটী খালাস করিয়া দেন।

হরিশের চরিত্র

হরিশ্চন্দ্রের বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় আমরা সম্যক্ প্রদান করিতে পারি নাই ; স্থূল কথায় এইমাত্র বলিতে পারি, তাঁহার বুদ্ধি-মত্তায় একদিকে যেমন দুর্দ্ধর্ষ লর্ড ডালহৌসী বিচলিত হন, তেমনি অন্যদিকে সদাশয় লর্ড ক্যানিং চিরবাধিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আমরা হরিশের অসাধারণ ধীশক্তি বা অসামান্য রচনাশক্তি প্রদর্শন করিতে ।৫৪। বিব্রত হই নাই। হরিশ্চন্দ্র বুদ্ধিমানের মধ্যে বুদ্ধিমান, লেখকের মধ্যে সুলেখক ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাহা দেখাইবার জন্য আমাদের এই ক্ষীণ চেষ্টা নহে ; হরিশ্চন্দ্র যে মানুষের মধ্যে একজন মানুষ ছিলেন, তাহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য। হরিশে আড়ম্বর ছিল না—দুইটা বড় বড় লাইবেলের মোকদ্দামা হরিশের উপর হইয়াছে, কিন্তু পেট্রিয়টে তাহার খবর মিলে না। হরিশের দক্ষিণ হস্তের দান সত্য সত্যই বাম হস্ত জানিত না—সহস্র সহস্র প্রজাকে তিনি নিজ হইতে যে আর্থিক আনুকূল্য করিতেন, তাঁহার নিতান্ত আত্মীয়বর্গ তাহা জানিতেন না। হরিশ স্বজাতি মধ্যে পক্ষভেদ জানিতেন না করিতেন না—জমীদার, প্রজা—ব্রাহ্ম, হিন্দু—শাস্ত্রাচারী, স্বেচ্ছাচারী—তিনি সকলের পক্ষেই সমান হরিশ্চন্দ্র ছিলেন। কি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কেরাণীগিরি, আর কি বৃটিশ ইণ্ডিয়ানের মুনসীগিরি কিছুতেই তাঁহার স্বাধীনতা ও তেজস্বিতা নষ্ট হয় নাই, তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জমীদার প্রজার উভয়েরই সমান সাহায্য করিতেন, কেবল দেশের মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া রাজকার্য্যের প্রতিবাদ ও পোষকতা করিতেন। হরিশ্চন্দ্র সত্য সত্যই হিন্দুপেট্রিয়ট।

ত্যাগ স্বীকার যে দেশহিতৈষিতার কার্য্যে নাই সে দেশবাৎসল্য কেবল ভণ্ডামী তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। হরিশ্চন্দ্রের জীবনে এমন কোন কার্য্য নাই যাহাতে কঠোর ত্যাগ স্বীকার দেখিতে পাওয়া যায় না। বাল্যকাল হইতে কঠোর দারিদ্র্য ও কষ্ট তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী ছিল। ভগবান তাঁহাকে ভারতের কোটি কোটি লোকের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া বিশেষ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। দুঃখের দর্পণে প্রতিদিন মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে দুঃখীর দুঃখ দূর করা কি মহান্ ধর্ম্ম। তাই

তিনি ৪০০ টাকার কেরাণীগিরি করিয়া স্বোপার্জ্জিত ধন পরের দুঃখ নিবারণে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

মরণ সময়ে তাঁহার বাটী ঋণে বদ্ধ হইয়া বিক্রীত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। নিজের অর্থ দ্বারা হিন্দুপেট্রিয়ট সংস্থাপন করিয়া দেশের কল্যাণার্থ প্রতি মাসে ১০০ কিম্বা ১৫০ টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। নীল বিদ্রোহ সময়ে অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলার্থ নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় ও আহারাদি প্রদান করিয়া, বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ।৫৫। তিনি স্বার্থপর হইলে এই সকল কার্য্য না করিয়া হয়ত পরম সুখে দিনাতিপাত করিয়া পরিবার স্বজনের ভরণপোষণ জন্য মৃত্যুকালে বিশেষ সঙ্গতি রাখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস মধ্যে যে সকল মহান্ অমর পুরুষ মানবকুলের হিতসাধনে স্বীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়াছেন, সেই সকল অমর পুরুষের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র একজন। গ্যারিবল্ডী ও ম্যাটসিনী কস্থুথ ও রুসো ইউরোপে যে স্বর্গীয় অনন্তকাল স্থায়ী দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, হরিশও ভারতে তাহাই দেখান। ঈশ্বর প্রদত্ত অসামান্য দেবদুর্লভ নিঃস্বার্থপরতার ও দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া, নিজের ও আত্মীয়স্বজনের সুখের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রীকে পথের কাঙ্গালিনী করিয়া, স্বীয় অর্থ দুঃখীর দুঃখমোচনে চিরনিয়ত ব্যয় করা হরিশের কীর্ত্তি। হরিশ্চন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর হেয় স্বার্থপর মানবজীবনে ধিক্কার প্রদান করিয়া স্বীয় জীবন ভারত মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই যতদিন ভারতে মনুষ্যের বাস থাকিবে, ততদিন হরিশ্চন্দ্র অমর হিন্দুহিতৈষী বলিয়া যুগযুগান্তেও পরিচিত হইবেন। ।৫৬।

পরিশিষ্ট

হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক
মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের
স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য
বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন।

[কালীপ্রসন্ন সিংহ]

বঙ্গবাসিগণ! আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে তোমাদিগের এক-জন পরম প্রিয়চিকীর্যু বান্ধব ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। ভারতভূমি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছেন, ত্রিংশৎ সালের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করেন নাই। তিনি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার যত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সতীদাহ নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবাবিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে পারেন নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় বিদ্রোহ সময়ে কেবল তাঁহার একমাত্র অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তিগুণে জলধি-জলমগ্নোন্মুখ বাঙ্গালিসম্মান সংরক্ষিত হইয়াছিল। যদি সে সময় তিনি না থাকিতেন, যদি সে সময় তাঁহার লেখনী নিরীহ বঙ্গবাসিবর্গের অনুকূলে চালিত না হইত, তাহা হইলে আজি আর বঙ্গদেশের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিত না। যখন বিদ্রোহসময়ে হৃতসর্ব্বস্ব বিগতবান্ধব, ।১। বৈরনির্যাতনাক্রান্তচিত্ত ইংলণ্ডীয়েরা নির্ব্বোধ সিপাহিদিগের সহিত বাঙ্গালিদিগকেও কলঙ্কিত করিতে সমূহ চেষ্টা করিয়াছিল; যখন উদ্বন্ধনে প্রাণদণ্ড ভিন্ন বাঙ্গালিদিগের আর অন্য গতি ছিল না; তখন কেবল একমাত্র তিনিই অগ্রসর হইয়া

আমাদিগের চিরপরিচিত সম্মান রক্ষা করেন; সেই বীভৎস সময় আজিও স্মরণ হইলে পাষাণহৃদয়ও কম্পিত হয়।

তখন ধনমত্ত ধনিগণ দাম্ভিকতা পরিহারপূর্ব্বক সম্পদসুলভ সুখভোগে বিরত হইয়া অন্তঃপুরে নিজ গৃহিণীর অঞ্চলদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন! সেই ভয়ানক দুর্ব্বিপাকে তিনি ভিন্ন আর কেহই অগ্রসর হন নাই।

তিনি যে শুদ্ধ বিদ্রোহে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন এমত নহে। ইংরাজি ১৮৫৩ সালে যখন পার্লিয়ামেন্ট কর্ত্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরে চার্টার প্রদত্ত হয়, সে সময় ভারতবর্ষীয়েরা কোম্পানির রাজ্য শাসন বিপক্ষে পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করেন, ঐ আবেদন পত্র তৎকর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়, উহা তাঁহার স্বহস্তলিখিত এবং ঐ প্রস্তাবে তাঁহার এতদূর গুণগরিমার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল যে, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা মুক্ত কণ্ঠে ঐ আবেদনের শত শত বার প্রশংসা করিয়াছিলেন;—তাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা প্রার্থনাধিক ফল লাভ করেন; সেবারে এই নিয়মে পুনর্ব্বার চার্টার প্রদত্ত হইল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিঞ্চিৎ মাত্র দোষ দেখিলেই কর্ত্তৃপক্ষীয়ের তাঁহাদিগের হস্ত হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিবেন। ১৮৫৫ সালে লার্ড ডেলহাউসি লাক্ষৌ গ্রহণ করণে মানস প্রকাশ করিলে, তিনি ভিন্ন সকল সম্পাদকই তাঁহার মতে অনুমোদন করিয়াছিল; তিনি অতি যথার্থ যুক্তির সহিত ডেলহাউসির অন্যায় মতের সমালোচন করিয়াছিলেন। এমন কি, তৎসময়ে তিনি তদ্বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকটন করেন; ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগেরও তাহাতে লজ্জিত হইতে হইয়াছিল। তিনি কহিয়াছিলেন, যদি

লাক্নৌ প্রদেশ শুদ্ধ অবিচারদোষে ইংলিস অধিকারভুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাঁরাই যে সুবিচার দ্বারা প্রজা রঞ্জন করিতেছেন তাহার প্রমাণ কি। পৃথিবীর সমুদায় প্রদেশেই বহু কাল পরম্পরায় এই রূপ রীতি প্রচলিত আছে এবং তাহাই স্বভাবসিদ্ধ যে, দেশের কতক অংশ রাজার পরম মিত্র আর কতক গুলিন বিলক্ষণ বিপক্ষ সুতরাং যদি ইংরাজদিগের বলবান্ বিপক্ষ নিকটে থাকিত তাহা হইলে ইহাদিগকেই অবিচারক বলিয়া ভারত সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া লইত। প্রতিবাসী নিজ পরিবারবর্গের প্রতি অত্যাচার করিলে যদি প্রতিবাসিবর্গের তাহারে শাসন করিবার নিয়ম থাকে; যদি ধনবান্ প্রতিবাসী নিজ ধনের ব্যবহার উত্তমরূপে না করিলে তদপেক্ষা বলবান্ প্রতিবাসীর তাঁহার সমুদায় ধন।৩। গ্রহণ করিবার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে লাক্নৌ রাজ্য অবিচারদোষে আত্মসাৎ করা অবিধেয় হয় নাই। এতদিনে সাধারণে একটি নূতন নিয়ম সংস্থাপিত হইল; যদি কাহারও বিবিধ ফলসম্পন্ন একটি মনোহর উদ্যান থাকে, যদি তাহার অধিকারী উহার উত্তম রূপে ব্যবহার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি ঐ উদ্যানে বঞ্চিত হইবেন এই আমাদিগের সুসভ্য ব্রিটিস্ সমাজের সনাতন মত।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন কেবল তাঁহার একমাত্র পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায়ে প্রচলিত হয় তাহার কোন কোন ভাগে বঙ্গবাসী ৩ কোটী লোক স্বাধীন প্রায় হইয়াছে। জমিদারদিগের প্রজাগণের উপর আর তাদৃশ প্রভুত্ব নাই; জমিদার মনে করিলেই প্রজাবর্গকে তাঁহার কর্ম্মালয়ে আসিতে হইবে, তিনি, শান্তিরক্ষকের অজ্ঞাতসারে প্রজার ধান্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিবেন এবম্প্রকার বহুবিধ

অনিষ্টকর নিয়ম একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

সাধারণ সম্প্রদায় ইংরাজদিগের পরামর্শে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক-সমাজে কত বার কত প্রকার ভয়ানক রাজবিধির পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অতীব সাবধানে প্রার্থিত বিধির সংস্কার, সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়াছেন। রাজদ্বারে বাঙ্গালিগণ তাঁহা দ্বারা যত উপকার লাভ ।৪। করিয়াছেন, চিরজীবন বিনিময়েও তাহা পরিশোধ্য নহে।

বঙ্গবাসিগণ! তোমাদিগের সেই মহোপকারী বান্ধব এক্ষণে বিগতজীবিত হইয়াছেন আর তিনি তোমাদিগের উপকার সাধনে সমুদ্যত হইতে সমর্থ হইবেন না আর তাঁহার লেখনী জন্মভূমির হিত সাধনে প্রধাবিত হইবেক না; এক্ষণে আর তিনি নাই! প্রিয় আত্মীয়বিরহে আপনারা যতদূর দুঃখভারগ্রস্ত হন, প্রিয়তমা সহ-ধর্ম্মিণী-বিরহে আপনারা যতদূর সন্তাপিত হইয়া থাকেন, প্রার্থনার প্রত্যাশাস্বরূপ সংসারসোপানে পদার্পণোদ্যত একমাত্র প্রিয়সন্তান বিয়োগে যতদূর দুঃখ প্রাপ্ত হইবেন; হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে আপনাদিগের ততোধিক দুঃখ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য! ঋণভারগ্রস্ত হতভাগ্য বণিক যদি সর্ব্বস্ব বিনিময়ে বাণিজ্যদ্রব্য সহিত অর্ণবপোতমধ্যে জলধিজলে মগ্ন হয়, যদি বহুপরিবারসম্পন্ন গৃহীর ভরণ পোষণের একমাত্র উপায় বৃত্তি বিহীন হয়, তাহা হইলে তাহারা যত ক্ষতি স্বীকার না করে, বাঙ্গালিসমাজ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি স্বীকার করিবেন! তিনি বাঙ্গালি-সমাজের অলঙ্কার ছিলেন; বঙ্গদেশ তাঁহা হইতে যত প্রত্যাশা করিতেন, সিপাহিরক্ষিত ঐশ্বর্য্যমত্ত ধনিদ্বারে তত প্রত্যাশা করেন

নাই। তিনি।৫। অন্ধতমসাচ্ছন্ন হিরণ্যখনির একমাত্র দীপশিখাস্বরূপ সুকোমল বনলতার সুবর্ণপুষ্পস্বরূপে বাঙ্গালিসমাজের শোভা-সম্পাদন করিয়াছিলেন।

আজিও সে দুর্নিমিত্ত সমূহরূপে রহিত হয় নাই ; এখনও হতভাগ্য প্রজাবর্গ নীলকরহৃতসম্পত্তি হইয়া চতুর্দ্দশ পুরুষাধিকৃত সুখসংসার পরিহারপূর্ব্বক দীনবেশে ভ্রমণ করিতেছে ; ভয়ানক, আত্মহত্যা,—ঘৃণাবহ বলাৎকার আজিও রহিত হয় নাই ; কিন্তু তন্নিবারণের সোপান কে আবিষ্কৃত করিল ? কেবল সেই হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র লেখনী গুণে সদয়হৃদয় রাজপুরুষেরা করুণ রসপরবশ হইয়া নীলকরদিগের ভয়ানক অত্যাচার নিবারণার্থ কমিটি নিযুক্ত করিলেন, তৎকর্ত্তৃক তত্ত্বানুসন্ধানে কত অত্যাচার তোমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেবল তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তিগুণে কত অচতুরা গৃহস্থবালা সতীত্বস্বরূপ বিমল সুখানুভোগে সমর্থা হইয়াছে।

হায়! পাষাণ হৃদয়েও যে সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হওয়া দুরূহ ; বিজ্ঞানবিহীন পশুচক্ষে যাহাও ঘৃণাকর বিবেচিত হয় ; এই সুসভ্য শ্বেত জাতিদিগের এমনি অপার মহিমা যে, অনায়াসে সরল হৃদয়ে সম্পাদন করিয়া থাকেন!!!

হা! নীলহলকর্ষিত প্রজাগণ! তোমরা যাঁহার একমাত্র অধ্যবসায় ও যত্নে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছ ; যিনি।৬। তোমাদিগের বরদ দেবতার ন্যায় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন, নিজ ব্যয়ে তোমাদিগের হিতসাধন করিয়াছেন ; সেই সদয়হৃদয় গুণনিধান আর জীবিত নাই, তিনি আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে তোমরা প্রার্থনাধিক

ফললাভে কৃতার্থ হইতে পারিতে; কিন্তু তিনি যে প্রকার সুদৃঢ় সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতারে তাঁহার গুণে বদ্ধ থাকিতে হইবে।

নিজকৃত কর্ম্মদ্বারা গৌরব লাভ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; স্বকীয় সৎকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না বলিয়াই তৎকৃত উপকাররাশি আজিও অনেকের অবিদিত রহিয়াছে নতুবা তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালির যত উপকার সাধন করিয়াছেন এতদিন কোন বঙ্গপুত্র দ্বারা তাহা সাধিত হয় নাই তিনি ১২৩১ সালে কুলীন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ ৩৭ বর্ষ বয়ঃক্রমে সাতবর্ষ সময়মধ্যে বঙ্গদেশের সমূহ শ্রীবৃদ্ধি করেন।

গৌরব গ্রহণ, রাজদ্বারে সম্মান বা স্বদেশীয়ের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া এক দিনের নিমিত্ত তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। জন্মভূমির হিতানুষ্ঠানে কায়মনোবাক্য ও জীবন পর্য্যন্ত সংকল্প করিয়াছিলেন; বাঙ্গালিসমাজে এবম্প্রকার লোক কয় জন জন্মিয়াছে? যিনি যে পরিমাণে বঙ্গদেশের শ্রী বৃদ্ধি করিয়াছেন, আমি প্রায় সকলেরই চরিত্র লক্ষ্য করিয়াছি; সুতরাং সাহস করিয়া।৭। বলিতে পারি যে, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় যেরূপ নিঃস্বত্বে ভারতবর্ষের শ্রী সাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন; কোন মহাত্মা সে প্রকার মন প্রাপ্ত হন নাই। অনেকে জানিত না, হরিশ্চন্দ্র বাবু হিন্দুপেট্রিয়ট্ সম্পাদন করেন; এবং তৎ-কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, এমন কি। তাঁহারে কখন নিজ মুখে ও তাহা স্বীকার করিতে শ্রবণ করা যায় নাই। যদি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে এতদিন আমাদের দুঃখের আর পরিসীমা থাকিত না শৃগাল কুক্কুরও

আমাদিগের দুঃখাংশ গ্রহণে সম্মত হইত না। আমরা এতদিনে আফ্রিকার ক্রীত দাসাপেক্ষায় সমধিক দুঃখনীরে নিমগ্ন হইতাম।

পূর্ব্বে রাজ্যশাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাহার সমালোচন করা এবং কি প্রকার নিয়মে হতভাগ্য প্রজাবর্গের শ্রী বৃদ্ধি হইবে তাহার সদুপায় নির্দ্দেশ করা রীতি বাঙ্গালিদিগের নিকট নিতান্ত অপরিচিত ছিল; কোন বাঙ্গালিই সাহস করিয়া রাজবিধি বিরুদ্ধে লেখনী চালন করেন নাই এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মের সংশোধনার্থ সদুপায় নির্দ্ধারণে অসমর্থ ছিলেন কিন্তু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় উল্লিখিত বিষয়ে প্রথমে হস্তক্ষেপ করিয়া বাঙ্গালিদিগের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তিনি যে সমস্ত সদুপায় নির্দ্ধারণ করিতেন, কি ব্যবস্থাপকসমাজ কি ইংলণ্ডীয় ।৮। কর্ত্তৃপক্ষ তাহা সাদরে গ্রাহ্য করিয়াছেন। শ্বেতপুচ্ছক ইয়ংবেঙ্গলদিগের যে প্রকার অপার মহিমা, কিন্তু হরিশ্চন্দ্র বাবুর তৎসহবাস সত্ত্বেও তাহাদিগের অনুসরণ করেন নাই। তিনি সাহেবদিগের একদিনের জন্য তোষামোদ করেন নাই। পরনিন্দা, হিংসা, অযথা কথা ও পরানিষ্টচেষ্টা তাঁহারে স্পর্শও করিতে পারে নাই। তিনি স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের উন্নতি দেখিলে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেন; স্বদেশীয়বর্গের দুঃখ দর্শনে তাঁহার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইত। যাহাতে ক্রমে বাঙ্গালিরা রাজ্য শাসন ভারের অংশ প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ডের ন্যায় স্বাধীনতন্ত্রভুক্ত হয়, ইহাই তাঁহার চিরপ্রার্থিত অভিলাষ ছিল; তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাবলে অবশিষ্ট সাধারণ সম্প্রদায়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন; অপর সমাজস্থ মনুষ্যগণ যেমন ব্রাহ্মণের অধীন ছিল এবং ব্রাহ্মণেরাই যে প্রকারে সামান্য সমাজের শাসন করিতেন; সেইরূপ জমিদারবর্গে

প্রজাগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। প্রজাগণ তাঁহার মতেই মত প্রদান করে এবং সকলে তাঁহারেই একমাত্র প্রিয়চিকীর্ষু জ্ঞানে তাহার উপর আপনাদিগের সমুদায় প্রিয় কার্য্যের ভারার্পণ করত নিশ্চিন্ত হয়; জমিদার সরল হৃদয়ে পক্ষপাতরহিত হইয়া নিয়ত তদধীনস্থ প্রজাবর্গের শুভানুধ্যান করেন। তাহা হইলে ক্রমে ভারতবাসীরা ইংলণ্ডের প্রজাগণের ন্যায় স্বাধীনতাসুখ ।৯। ভোগে সমর্থ হইবে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে, মগ বা চিনারা ভারতবর্ষ জয় করত ইংরাজদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলে আমরা সুখী হইব অথবা বাঙ্গালিরা যুদ্ধে ইংরাজদিগকে পরাজিত করিলেই স্বাধীন হইব। স্বাধীনতা যে কি এবং তজ্জনিত সুখ কি প্রকারে সম্ভোগার্হ তাহা হরিশ বাবুই বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। যদি ক্রমে কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবর্ষীয়দিগকে উপযুক্ত বিবেচনায় রাজ্যশাসনে অংশ প্রদান করেন যদি আমরা পার্লিয়ামেণ্টে আপনাপন জন্মভূমির হিতবাসনার পরামর্শে রত হই, তাহা হইলেই আমরা স্বাধীন বলিয়া পরিচিত হইলাম। হায়!! যিনি এই সমূহ মঙ্গলময় উপায় উদ্ভাবন করেন, এক্ষণে সেই গুণনিধান, হতভাগ্য বঙ্গবাসীর অদৃষ্টদোষেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন; এক্ষণে তৎকৃত উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রোমে বা গ্রীসে, এথেন্সে অথবা ইজিপ্টে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে আজি তাঁহার মৃত্যুতে সংসার শোকচিহ্নে অঙ্কিত হইত। প্রশস্ত প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও সুবিস্তৃত মণ্ডপ সমূহ তাঁহার স্মরণার্থ নির্ম্মিত হইত, প্রকাশ্যস্থলে তাঁহার গুণগরিমা অনিয়ত সঙ্গীত হইত; তিনি জীবিতাবস্থায় পিতৃতুল্য সম্মান পাইতেন ও দেহাবসানে

দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন। কিন্তু যে দেশে উপকার স্বীকার করা।১০। সুদূরপরাহত, দুর্ভাগ্যক্রমে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের ব্রাহ্মগণ! এই বার তোমাদিগকে সম্বোধনে উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি; তোমাদিগের সহৃদয় বান্ধব হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; এক্ষণে তাঁহার স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন করণ জন্য তোমাদিগের সাধ্যানুসারে সাহায্য করা উচিত। সামান্য পৌত্তলিকদিগেব ন্যায় তোমাদিগের সংসারের অধিক অর্থ ব্যয় হয় না; তোমরা শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া থাক; পৌত্তলিক কর্ম্মকাণ্ডের সংস্রব রাখ না সুতরাং দেবপূজক উৎসবপ্রিয় বাঙ্গালি হইতে ব্রহ্মজ্ঞানীর সংসার অতি সুলভে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত এতাদৃশ অসদৃশ সৎ সঙ্কল্পে তোমাদিগকেই বিশেষ সাহায্য করিতে হয়, বলিতে গেলে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এক জন প্রকৃত আচার্য্য ছিলেন, তাঁহার যত্নেই—তাঁহার পরিশ্রমেই ভবানীপুরে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নীত ও উপাসনার্থ সমাজমন্দির নির্ম্মিত হয়— তাঁহার স্বদেশহিতচিকীর্ষাগুণে সাধারণে যে পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, তোমাদিগের তদপেক্ষা শত গুণে শোক প্রকাশ করা বিধেয়।।১১।

প্রিয়চিকীর্ষুর স্মরণচিহ্ন স্থাপন করিলে পৌত্তলিক ধর্ম্মে উৎসাহ প্রদান করা হয়, বোধ করি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে এরূপ লিখিবে না।

এক্ষণে তাঁহারে চিরস্মরণীয় করণার্থ ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ

বনিতার প্রাণপণে কায়মনোবাক্যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য ; যদি আমাদের রামমোহন রায়ের নিকট, বিদ্যাসাগরের নিকট, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিধেয় হয় তাহা হইলে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট শত গুণে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কলিকাতা নগরীয় ঐশ্বর্য্যমত্ত ধনিগণ! এক বার স্বদেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি রোপণ কর। গৃহপতি মদ্যপ ও লম্পট হইলে সংসারের যেরূপ বিশৃঙ্খল হয় —তোমাদিগের ঐশ্বর্য্যমত্ততায় বঙ্গদেশের তদনুরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। সাধারণহিতকরী কার্য্যে যদি তোমরা কায়মনে সাধ্যানুসারে সাহায্য না করিবে যদি তোমরা শ্রেষ্ঠত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া দুরবস্থা মোচনে সচেষ্ট না হইবে তাহা হইলে চিরদিনেও ভারতের সুখ সৌভাগ্যের উন্নতি হইবে না। তোমরা অতুল ধন প্রাপ্ত হইয়াছ তৎসকলই সাধারণহিত কার্য্যে ব্যয় কর আমার এরূপ প্রার্থনা নহে, যদি তোমাদিগের স্মরণমাত্র থাকে যে, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে অযত্ন করা,—সমাজের উন্নতিতে উপহাস ও মঙ্গলময় কার্য্যে ব্যয় না করা ; ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট পদার্থ মনুষ্য নামধারীর উচিত নহে—তাহা হইলে বিজ্ঞানবিহীন বন্য মর্কটে ও ঐ ধনীতে বিশেষ কি ; তাহা হইলেই যথেষ্ট ।১২। হইবেক , যদি তোমরা বিশ্রাম সুখশয্যায় শায়িত হইয়া নিজ নিজ অবস্থা বিষয়ে চিন্তা কর, যদি তোমরা এক দিনের জন্যও ভাবিয়া দেখ যে ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া এত অতুল ধনের অধিপতি হইয়া জন্মভূমির কি উপকার সাধন করিলাম, কয় জন অনাথ তোমাদের সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া মনুষ্য নামে পরিচয় দানে সমর্থ হইতেছে ? কয় জন বিধবা তোমাদিগের উদ্যোগে পুনর্ব্বার পতি প্রাপ্তে বিবিধ দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত হইয়াছে ? স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে

কোন বিখ্যাত ধনি কয় টাকা ব্যয় করিয়াছে? তোমরা মৃত পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে, পুত্র কন্যার বিবাহ সময়ে ধন ব্যয় করিয়া থাক, সে কেবল প্রশংসা লাভের এক মাত্র উপায়, তাহাতে তোমাদের লাঙ্গুল আর ফুলিয়া উঠে এবং শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হও, তোমাদিগের আত্মবিস্মৃতি, সামান্য লোকদিগের যাতনার কারণ মাত্র।

তোমরা স্থির করিয়াছ যে, তোমরা হনুমানের ন্যায় অমর, কখনই মরিবে না—চিরকাল বালাখানায়, বৈঠক খানায়—বাগানে সুখে বিহার করিবে, স্বদেশের শুভ চিন্তায় বিরত হওয়া, তাহার শ্রীসাধন কার্য্যে ব্যয় করা মূর্খের কায। সুতরাং এবিষয়ে তোমাদিগের অপেক্ষা নীলকার্য্যের প্রজাগণে অধিক সাহায্য করিবে—কৃষকের সরল হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ। আজি যদি সোনা-।১৩,-গাজীর খোঁড়া ব্রহ্মের শ্রাদ্ধ হইত বা পাগলা ছিরুর সপিণ্ডন হইত তাহা হইলে তোমরা সাহায্য করিতে পথ পাইতে না; আজি আস্তাবল বা হোটেলরক্ষক কোন ফিরিঙ্গী মরিলে সাধ্য মতে সাহায্য করিতে। তোমরা চালচিত্রের অসুরের মত শুদ্ধ দর্শনীয় নতুবা পদার্থে তৃণ হইতেও নিকৃষ্ট। এক্ষণে উপসংহার সময়ে বঙ্গদেশবাসীদিগের নিকট আমার নিবেদন এই, যে মহাত্মা তোমাদিগের এত উপকার সাধন করিয়াছেন, যদ্দারা অনেক বিষয়ে তোমরা প্রাপ্তকাম ও পূর্ণমনোরথ হইয়াছ; যিনি নিজ ধীশক্তিবলে সানশোধিত মণির ন্যায় মেঘত্যক্ত দিনকরের ন্যায় স্তবকত্যক্ত পুষ্পের ন্যায় বাঙ্গালিসমাজ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারে চিরস্মরণীয় কর।

নীলকরহৃতসর্ব্বস্ব বঙ্গদেশীয় প্রজাগণ। আমি বঙ্গদেশীয় কি

ধনবান্ কি গৃহস্থ সকলকে উপেক্ষা করিয়া প্রথমে তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দি, দেখিও কৃষকের কোমল হৃদয়ে যেন অকৃতজ্ঞতা স্পর্শ করিতে না পারে। যে মহাত্মা তোমাদিগের জীবনপ্রদান করিয়াছেন যাহা হইতে তোমরা যমযাতনাপেক্ষা গুরুতর ক্লেশে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছ; সুদ্ধ যাহার এক মাত্র যত্নে তোমাদিগের সর্ব্বস্ব রক্ষিত হইয়াছে; সতীগণে সতীত্ব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছে; অকাল মৃত্যু, উদ্বন্ধনে প্রাণনাশ, গ্রামদাহ রহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যেরূপ।১৪। ভাগ্য—দেবতা সহায়েও তোমাদিগের যে দুরবস্থার অপনোদন না হইত একা হরিশ্চন্দ্রের দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে সুতরাং তাঁহারে—অভীষ্ট দেবতার ন্যায় পিতার ন্যায় ও প্রাণদাতার ন্যায় স্মরণ করা কর্ত্তব্য। আমার আর অধিক বলা প্রয়োজনাভাব যদি তোমরা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কৃত উপকারে কৃতজ্ঞ না হও তাহা হইলে তোমরা কি বলিয়া মুখ দেখাইবে বলিতে পারি না এবং পরিণামে তোমাদের যে কি দুর্দ্দশা হইবে তাহারও ইয়ত্তা করা যায় না।

[সারস্বতাশ্রম, ১৭৮২ শকাব্দাঃ]

ভারতবর্ষীয় সমাজ হইতে নিম্ন লিখিত মহাশয়েরা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন জন্য ধন সংগ্রহার্থ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

" রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর।
" রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর।
" রমাপ্রসাদ রায় বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।
" রামগোপাল ঘোষ।
" রমানাথ ঠাকুর।
" যাদবকৃষ্ণ সিংহ। ।১৫।
" কালীপ্রসন্ন সিংহ।
" রাজেন্দ্রলাল মিত্র।
" পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
" দিগম্বর মিত্র।
" তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
" কৃষ্ণকিশোর ঘোষ।
" প্যারীচাঁদ মিত্র।
" কিশোরীচাঁদ মিত্র।
" মৌলবী আবদুল লতীব।
" চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।
" ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।
" গিরীশচন্দ্র ঘোষ।
" কৃষ্ণদাস পাল।
" জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়। ।১৬।

(কলিকাতা, পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্র)

দেশব্রত হরিশ্চন্দ্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

কিছুকাল হইল, আমরা বিগত যুগের শিক্ষিত বঙ্গসমাজের অন্যতম নেতা, সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও সুলেখক, 'ইণ্ডিয়ান্ ফীল্ডের' সম্পাদক স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনচরিতের উপকরণাদি সংগ্রহ করিতেছি। সম্প্রতি এই মহাত্মার কয়েক বৎসরের 'ডায়েরী' আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এই রোজনামচা হইতে তৎকালীন সমাজের একটি অবিকল ছায়াচিত্র পাওয়া যায়, এবং তৎকালীন প্রসিদ্ধ দেশনায়কগণের জীবনের অনেক কথা অবগত হইতে পারা যায়। একদিন প্রসঙ্গক্রমে পরমশ্রদ্ধাস্পদ 'সাহিত্য' সম্পাদক মহাশয় আমাকে এই রোজনামচা অবলম্বন করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক দেশব্রত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিশোরীচাঁদের অন্যতম অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কিশোরীচাঁদের রোজনামচায় হরিশ্চন্দ্রের কথা বহু স্থানে লিপিবদ্ধ আছে। হরিশ্চন্দ্রের শেষ পীড়ার কথা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে দিবসের রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করিয়া, তাঁহার অসাধারণ চরিত্রগুণ সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন। এই মন্তব্যগুলি পরে বিশদাকারে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২২ শে জুন দিবসের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রিকায় হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধে প্রকাশিত করেন। নিম্নে সেই প্রবন্ধটির অবিকল অনুবাদ প্রদত্ত হইল। সংবাদপত্রের স্তম্ভে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা অনেক সময়েই,

মাসিকপত্রে প্রকাশ করা শোভন নহে। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণ-গুলির পর্য্যালোচনা করিলে এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম, বোধ হয় অসঙ্গত বোধ হইবে না :—

(১) অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক পূর্ব্বের দেশীয় সংবাদপত্রাদি এতদ্দেশের শ্রেষ্ঠতম পুস্তকালয়েও দুষ্প্রাপ্য। আমাদিগের দেশে রোজনামচা রক্ষা করিবার প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না।

(২) যে অসাধারণ বাঙ্গালী ছয় বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে নূতন ভাবের ও নূতন শক্তির সঞ্চার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহার উল্লেখযোগ্য জীবনচরিতের অভাব এখনও বাঙ্গালীর কলঙ্ক-স্বরূপ। যদি ভবিষ্যতে কেহ এই কলঙ্কমোচনে অগ্রসর হয়েন, এবং তিনি যদি এই প্রবন্ধ হইতে কোনও প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে, এই প্রবন্ধের অনুবাদ-প্রকাশ বিফল হইবে না। ।৩৬২।

(৩) এই প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্রের চরিতের নূতন উপকরণাদি না থাকিলেও, তাঁহার সমসাময়িক অন্যতম দেশ-নায়ক ও সহচরের মানসপটে তাঁহার জীবন ও চরিত্র কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা আধুনিক পাঠকের পক্ষে কৌতুহলপ্রদ হওয়া সম্ভব। —অনুবাদক।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু,—যে শোকাবহ ঘটনা বিগত শুক্রবার ১৪ই জুন দিবসে সংঘটিত হইয়াছে, তাঁহার দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক যথার্থই একটি জাতীয় শোকের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের মনে তাঁহার নাম দেশপ্রাণতার সহিত

বিজড়িত, এবং অধিকাংশ ব্যক্তিরই মনে জন-সাধারণের, এবং তাঁহাদিগের স্বাভাবিক নেতা জমিদারগণের উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গের সহিত সংশ্লিষ্ট।

হরিশ্চন্দ্রের নামে, আমাদিগের মনে কোনও ভারতীয় ঋষির কথা উদিত হয় না। যিনি রামমোহন রায়ের ন্যায় দেশে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নবজীবনের প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রযত্ন করিয়াছিলেন; মনে হয়, সেই সর্ব্বপ্রকার অন্যায় ও অত্যাচারের পরম শত্রুর বিষয়, নীলকরগণের নির্ম্মম অত্যাচার, অনধিকারচর্চ্চার অসংযত উপদ্রব, এবং রাজকর্ম্মচারিগণের অন্যায় ও অবৈধ কার্য্যপ্রণালী যাঁহার তীব্র সমালোচনার লক্ষ্য ছিল; ক্ষমতার অপব্যবহার ও শক্তির অপচারে বিধিসঙ্গত বাধাপ্রদানের সহিত তাঁহার নাম অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। যখন সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার বিয়োগে কাতর, এবং তাঁহার যশোগানে মুখরিত, সেই সময়ে বর্ত্তমান লেখকের পক্ষে, যথাযথভাবে তাঁহার চরিত্রবিশ্লেষণ ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার জীবনকথার বর্ণন সময়োপযোগী হইবে না। সুতরাং কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত না করিয়া, কিছুমাত্র গোপন না করিয়া, অতি অল্প কথায় তাঁহার কঠোর অথচ কোমল চরিত্রের পরিচয় প্রদানে প্রয়াস পাইব। বর্ত্তমান লেখক এই রচনার বিষয়ীভূত মহাত্মার সহিত সাধারণ এবং ব্যক্তিগতভাবে, সাহিত্যক্ষেত্রে ও রাজনীতিক্ষেত্রে মিলিত ছিলেন। তাঁহার বহু পরিচিত বন্ধুবর্গ অপেক্ষা তিনি তাঁহাকে সূক্ষ্মতরভাবে ও সমভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ।৩৬৩। মনের সর্ব্বাপেক্ষা অনমনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—যে অবস্থা তাঁহার স্বাভাবিক হইলেও বোধহয় সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর নহে। যদ্দারা মানুষের

আভ্যন্তরীণ জীবনের সুন্দর অন্তর্দৃষ্টিলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লেখক তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সেই সকল অবস্থা অবলোকন করিয়াছেন। লেখক এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তাঁহার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতেছেন না, কেবল মাত্র এই বিষয়ে, হস্তক্ষেপ করিবার কারণ প্রদর্শন ও আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীতে কোনও প্রতিভাবান্ বা শিক্ষিত হিন্দুর জীবনের ঘটনা অসাধারণ বা বৈচিত্র্যময় হওয়া অসম্ভব। সামাজিক, রাজনীতিক ও সামরিক উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকায়, তাঁহাকে সচরাচর কলিকাতায় কোনও অফিসে কেরাণী রূপে অথবা অত্যন্ত সৌভাগ্য থাকিলে, কোনও পরগণার বা সবডিভিসনের তালুকদার বা সবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে, কোনও ক্রমে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়; দেশের সকল প্রকার উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত হইয়া, তাঁহারা কেরাণীর ডেস্কে ও ক্ষুদ্র কাছারিতে উৎসর্গীকৃত শক্তিকে কোনও বিস্তৃত প্রদেশ শাসনের ক্ষমতায় বিকশিত করিতে পারেন না। যে প্রতিভা মহাত্মা আকবরের সৈন্যগণকে বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রদান করিয়াছিল, এবং সাম্রাজ্যের কোষাগার সমৃদ্ধশালী করিয়াছিল, অবিশ্রান্ত লেখনী চালাইয়া, খাজনা আদায় করিয়া, অথবা চোর ধরিয়া, সে প্রতিভার স্ফুরণ হওয়া অসম্ভব। সার্দ্ধ দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে হরিশ্চন্দ্র হয় ত টোডরমল্ল অথবা আবুল ফজল্ হইতে পারিতেন। কিন্তু যে শাসনপদ্ধতিতে সমস্ত শক্তি অপচিত হয় এবং সমস্ত প্রতিভা বিনষ্ট হয়, তাহারই ফলে, তিনি সামান্য কেরাণীর ন্যায় জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সহকারী মিলিটারী-অডিটররূপে জীবনের চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুরে হরিশ্চন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কোনও কুলীন ব্রাহ্মণের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতামাতা হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ন্যায় তাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। হরিশ্চন্দ্রের সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহারা তাঁহাকে বহুবিষয়ে পারদর্শী ও ধর্ম্মশীলতার জন্য বিখ্যাত স্বর্গীয় রেভারেণ্ড মিঃ পিফার্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইউনিয়ন স্কুল নামক ।৩৮৪। মিশনারী (অথবা স্বাধীনভাবে পরিচালিত) বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। এই-খানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। তিনি আট বৎসর কাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তিনি শিক্ষকবৃন্দের উচ্চ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও তত্ত্বাবধায়ক মিঃ পিফার্ডের সস্নেহ ব্যবহারে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিষ্টার পিফার্ডের সেই সতত স্নেহশীল ও সদয় ব্যবহার তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর কৃতজ্ঞতার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিলীন হয় নাই। একদিন আমাদিগের বাটীতে কলিকাতা বারের মিষ্টার সি, পিফার্ডের সহিত হরিশ্চন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাব কোনও প্রশ্নের উত্তরে মিঃ পিফার্ড বলেন, তিনি রেভারেণ্ড মিষ্টার পিফার্ডের পুত্র। ইহা শুনিয়া হরিশ্চন্দ্রের অশ্রু-বারি উথলিয়া উঠিয়াছিল। তথাপি এমন লোকও আছেন, যাঁহারা দেশবাসীর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নামক কোনও বৃত্তির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।

বাল্যে হরিশ্চন্দ্রের যে প্রতিভা লক্ষিত হইয়াছিল, যৌবনে তাহা আশাতীতরূপে বিকশিত হইয়াছিল। তিনি পাঠে দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং শীঘ্রই মফঃস্বলস্থ প্রাথমিক শিক্ষালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর পাঠ্যসমূহে অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, এবং পর বৎসর হিন্দু কলেজের উচ্চবৃত্তির জন্য (Senior scholarship) পরীক্ষা প্রদান করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ইহাতে অকৃতকার্য্য হয়েন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা বিনাবেতনে শিক্ষালাভ ব্যতীত অন্য কোনও রূপে কলেজের উচ্চশিক্ষালাভের অন্তরায় হওয়াতে, তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হয়। প্রথমে তিনি তৎকালীন নীলামদার টলা এণ্ড কোম্পানীর অফিসে মাসিক ১২ টাকা বেতনে কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মিলিটারী অডিটর-জেনারেলের অফিসে একটি কেরাণীর পদ শূন্য হওয়ায়, উহার জন্য তিনি আবেদন করেন। ঐপদের মাসিক বেতন ২৫ টাকা মাত্র, কিন্তু প্রার্থী অনেক ছিলেন। তাঁহাদিগের পরীক্ষাগ্রহণ করা হইল ; কারণ, তখন এই পরীক্ষাগ্রহণের বাতুলতা (Mania) আরম্ভ হইয়াছে। মিষ্টার জর্জ্জ কেল্‌নার পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষার বিষয় ছিল একটি প্রবন্ধরচন এবং পাটীগণিত। সমস্ত ।৩৬৫। কাগজ দেখিয়া মিষ্টার কেল্‌নার হরিশ্চন্দ্রের উত্তরপত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিলেন। এইরূপে তিনি কেরাণী-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই কেরাণী-জীবনের প্রভাব, যাহা সচরাচর প্রতিভা নির্ব্বাপিত-প্রায় করে, হরিশ্চন্দ্রের মানসিক গঠনের উপর তাদৃশ অনুৎসাহজনক অধিকার বিস্তার করিতে পারে

নাই। উহা তাঁহার সুন্দর বলিষ্ঠ প্রতিভা নির্ব্বাপিত করে নাই, করিতে পারে নাই। কিন্তু কিছু খর্ব্ব করিয়াছিল। তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ শীঘ্রই তাঁহার কর্ম্মনিপুণতা স্বীকার করিলেন, এবং তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা হরিশ্চন্দ্রকে জ্ঞানার্জ্জনে উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত উচ্চজ্ঞান অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বহুবিধ পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছিলেন। এইরূপ একজন কর্ম্মচারী আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, হরিশ্চন্দ্র প্রায়ই নিজের সংগ্রহ হইতে ও কলিকাতা পব্‌লিক লাইব্রেরী হইতে পুস্তক আনাইয়া তাঁহাকে পড়িতে দিতেন। অধিকাংশ হিন্দু যুবক, যাঁহারা বিদ্যালয়-পরিত্যাগের সহিত পুস্তকাদির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করেন, তাঁহা-দিগের অপেক্ষা তিনি কত বিপরীতভাবাপন্ন ও কত শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, শৈশবে মানুষের শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং মৃত্যুতে শেষ হয়, তিনি তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন, এবং এতদ্দেশ-বাসীর পরম-মিত্রগণের নিকট হইতে 'এতদ্দেশে প্রতিভাশালী বালক আছে, কিন্তু প্রতিভাশালী মনুষ্য নাই'—এই যে অভিযোগ প্রায়ই শ্রবণ করা যায়, সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াও হরিশ্চন্দ্রের এই অসাধারণ শিক্ষানুরাগ সেই অভিযোগের প্রকৃত প্রতিবাদ। তাঁহার পাণ্ডিত্য তত গভীর ছিল না, কিন্তু তিনি ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক বহু সংখ্যক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনের চিন্তাশীল ভাব, অসাধারণ তর্কশক্তি, অপূর্ব্ব মেধা, যাহা পড়িতেন,—তাহা নিজস্ব করিবার বিস্ময়কর ক্ষমতা, এবং রাজনীতিতে অনুরাগের ফলে তিনি অল্পবয়সেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শীঘ্রই তিনি

লেখনী ধারণ করিলেন, এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এক বন্ধুর সহিত পরিচালিত একটি সাময়িকপত্রে তাঁহার অধ্যবসায়ের ফল ও সাহিত্যিক প্রতিভা প্রকাশিত হইল। 'বেঙ্গল রেকর্ডারে' তাঁহার প্রথম রচনাশক্তি বিকাশ ।৩৬৬। প্রাপ্ত হয়। কিন্তু 'হিন্দুপেট্রিয়ট' প্রতিষ্ঠার * পূর্ব্বে সাহিত্যজগতে তিনি যশঃ অর্জ্জন করেন নাই। তাঁহার সম্পাদকত্বে 'হিন্দুপেট্রিয়ট' শীঘ্রই অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। উহা দেশবাসীর মুখপত্রস্বরূপ হইল, এবং সাধারণ বিষয়ে লোকমত অবগত হইবার জন্য উৎসুক গভর্ণমেণ্টের নিকট রাজভক্তি জ্ঞাপনের উপায়স্বরূপ হইল।

কিন্তু হিন্দুপেট্রিয়ট দেশবাসী কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রথম ইংরাজী সংবাদপত্র নহে। সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র Reformer (সংস্কারক) প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, এবং তিনিই উহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তাহার পর রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার Enquirer (জিজ্ঞাসু) প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার সংশয় দূর হইবামাত্র ঐ কাগজ বন্ধ হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে জ্ঞানালোকবিস্তার কল্পে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য অধুনাবিলুপ্ত পত্রিকার মধ্যে 'জ্ঞানান্বেষণ'ই শ্রেষ্ঠ। ইহা সাপ্তাহিক ও দ্বিভাষী পত্রিকা ছিল,

* 'বেঙ্গলী' পত্রিকার প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক দেশপ্রাণ মহাত্মা গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক 'বেঙ্গল রেকর্ডার' ও 'হিন্দুপেট্রিয়ট' উভয় সংবাদপত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়। মৎপ্রকাশিত Life of Grish Chunder Ghose নামক পুস্তকে এই পত্রিকাদ্বয়ের ইতিহাস আছে। ৯০ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।—অনুবাদক।

এবং স্বর্গীয় রসিককৃষ্ণ মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। 'জ্ঞানান্বেষণে'র পরে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক আর একটি দ্বিভাষী সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। ইহা বাবু রামগোপাল ঘোষ ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত এবং ইহার জীবনকালে নিপুণতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত সমাজসংস্করণের জন্য যুঝিয়াছিল। কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দুইণ্টেলিজেন্সার'ও দেশের অনেক উপকার সাধন করিয়াছিল। দ্বৈভাষিকতা 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে'র স্বল্পায়ুর কারণ। হরিশ্চন্দ্র এই ভ্রান্তপথ পরিহার করিয়াছিলেন। 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সর্ব্বদাই স্বাধীনভাবে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছে, এবং অত্যাচারীর বিপক্ষে অত্যাচারিতের পক্ষে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছে। ইহার সাধারণ ও রাজনীতিক বিষয়সমূহের আলো-চনায় অসাধারণ দক্ষতা ও বিচারশক্তি প্রকটিত হইত। মার্কুইস্ অব্ ড্যালহৌসীর সর্ব্বগ্রাসিনী নীতি ও অন্যান্য অবৈধ আচরণের নির্ভীক প্রতিবাদ হরিশ্চন্দ্রকে সম্পাদক-শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহার পর সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহিগণের নৃশংস অত্যাচার ইংরাজগণের ক্রোধাদি প্রবল রিপুগণকে উত্তেজিত এবং তাঁহাদিগের বিচারশক্তিকে খর্ব্ব করিল। তাঁহারা জ্ঞানশূন্য হইয়া অবিলম্বে প্রতিহিংসাগ্রহণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে 'পেট্রিয়ট' এই সকল উন্মত্ত ব্যক্তিগণের ও ভীত জনসাধারণের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে দণ্ডায়মান হইয়া দেশের অমূল্য উপকার সাধন করিয়াছিল। যখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব্ব সঙ্কটকাল উপস্থিত, এবং বেসরকারী য়ুরোপীয়গণ লর্ড ক্যানিং-এর পদচ্যুতির প্রার্থনা এবং দলবদ্ধ হইয়া

তাঁহার শাসনকার্য্যে বাধাপ্রদান করিতেছিলেন, তখন 'পেট্রিয়ট' এই উন্মত্ত ও অজ্ঞান আন্দোলনকারিগণকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, দেশবাসিগণকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সমবেত হইবার নিমিত্ত আহ্বান এবং ভারতবর্ষের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

নীলকর আন্দোলনে এই স্বদেশহিতৈষী (Patriot) যে কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দেশবাসিগণের কৃতজ্ঞতার অন্যতম কারণ। আমাদিগের সহযোগী দুর্ব্বল প্রজাগণের একজন কর্ম্মনিপুণ, উপযুক্ত ও নির্ভীক পক্ষসমর্থক হইয়াছিলেন। তাঁহার অকাট্য যুক্তি ও অশেষবিধ দৃষ্টান্ত সম্বলিত আক্রমণের প্রতিবাদ নীলকরগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

'হিন্দুপেট্রিয়টে' নীলকরগণের অত্যাচারের মর্ম্মস্পর্শী ও অবিশ্রান্ত প্রতিবাদ করিয়া যে উচ্চস্বর উত্থিত হইত, তাহাতেই এই অসাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রের প্রধানতম বৃত্তিগুলির স্বরূপ ও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্বর আন্তরিক দেশপ্রেমিকের কণ্ঠস্বর। আমরা গভীর চিন্তার পর হরিশ্চন্দ্রকে অসাধারণ বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য অতি গভীর ছিল না। হয় ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের নিম্নতম শ্রেণীর চতুর ছাত্রগণের ন্যায় সুন্দররূপে সেক্সপিয়র বা মিল্টন আবৃত্তি করিতে পারিতেন না; কিন্তু তিনি প্রভূত, অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ মানসিক বলের অধিকারী ছিলেন। তিনি কিরূপ হীন অবস্থায় জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাতে যে প্রতিভা ছিল, তাহা অকৃত্রিম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দারিদ্র্য উঁহাকে খর্ব্ব করিতে

পারে নাই। কখন শক্তি প্রয়োগের উপযুক্ত কাল, তাহা তিনি জানিতেন, এবং দেশে রাজনীতিক নবজীবনের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি আপনাকে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন। ।৩৬৮। তাঁহার মধ্যে যাহা কিছু মহৎ ছিল, যাহা কিছু অকিঞ্চিৎকর ছিল, সমস্তই তিনি একই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত নিয়ত নিয়োজিত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। সেই সংকল্পসিদ্ধির জন্য যে সকল অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয়, তাহাই তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতেন। সেই সংকল্পসিদ্ধিই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা সেই সংকল্পসিদ্ধির পক্ষে বাধা প্রদান করিতেন, তাঁহারাই তাঁহার শত্রু ছিলেন। যদিও তিনি সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার বিষয়ে একবারে উদাসীন ছিলেন না, তথাপি, (আমাদিগের বোধ হয়, তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন) রাজনীতিক অবস্থার উন্নতির অসাধারণ কার্য্যকরী শক্তিতে আস্থাবান ছিলেন। এইজন্য তিনি তাঁহার দেশবাসিগণের মধ্যে রাজনীতিক নবজীবনসঞ্চারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা প্রকাশ্যভাবে এইভাব প্রকাশ করিতেন। আমাদিগের স্মরণ হয়, একদা আমাদিগের ভবনে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবৃত্ত রেভারেণ্ড ডাক্তার ডফের সাক্ষাতে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস যে, কেবলমাত্র রাজনীতিক উন্নতির দ্বারা আমাদিগের দেশের নবজীবনসঞ্চাররূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। আমরা অস্বীকার করি না যে, ন্যায়সঙ্গত রাজনীতিক অধিকারলাভ দেশকে সঞ্জীবিত করিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় (যথা,—যে সকল রাজনীতিক ক্ষমতার অভাবে দেশ শক্তিহীন, সেই সকল অভাব মোচন কর,

দেশবাসিগণকে রাজনীতিক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ প্রদান কর; মহারাণীর ঘোষণাপত্রের সাধু সংকল্প পূর্ণ কর)। কিন্তু রাজনীতিক উন্নতির সহিত সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-লাভ না হইলে যথার্থ ভারতপ্রেমিকের আশা পূর্ণ হইতে পারে না।

আমরা এই পত্রিকার স্তম্ভে 'হিন্দুপেট্রিয়টে'র স্বর্গীয় সম্পাদককে প্রায়ই ভ্রান্ত স্বদেশহিতৈষী বলিয়া অভিহিত করা কর্ত্তব্যবোধ করিয়াছি; কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমরা তাঁহার স্বদেশ-প্রেমিকতার অকৃত্রিমতা বা আগ্রহে সন্দিহান হই নাই।

আমাদের আরও বিশ্বাস যে, তিনি আশাপূর্ণ স্বদেশহিতৈষী ছিলেন, এবং আমাদিগের ন্যায় এবং আমাদিগের অধিকাংশ বন্ধুবর্গের ন্যায় অন্ধকারময় বর্ত্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দেখিয়া ব্যথিত হয়েন নাই। তিনি সর্ব্বদাই প্রত্যেক অবস্থার আশা-পূর্ণ অংশটি দেখিতেন, ।৩৬৯। এবং যে সমাজে তিনি বাস করিতেন, গতায়াত করিতেন, এবং যে সমাজে তাঁহার অস্তিত্ব ছিল, তাহার ভীষণ ক্ষতপূর্ণ অঙ্গটি দেখিতে পাইতেন না। তাঁহার দেশবাসিগণের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন-সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে তাঁহার যে চরম মত ছিল, তাহার কারণ তাঁহার এই মনের ভাব। আমরা অবশ্য অতি দুঃখের সহিতই এই সকল কথা বলিতেছি, ক্রোধবশতঃ নহে; কারণ, আমরা বিশ্বাস করি যে, যথার্থ চিকিৎসকের ন্যায় ক্ষত আরোগ্যের পূর্ব্বে ক্ষতের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত শলাকাপ্রবেশিত করা যথার্থ সংস্কার-কের কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি সংস্কারক-রূপে হরিশ্চন্দ্রের কোনও দোষ বা ত্রুটি-লক্ষিত হইয়া থাকে, তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রগুণে, তাঁহার সারল্যে, তাঁহার আন্তরিকতায়, তাঁহার প্রকৃতিগত উচ্চ হৃদয়ে

তাহা যথেষ্টরূপে সংশোধিত করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ উচ্চমনা ছিলেন, সেইরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি যথার্থ অতিথিসেবা-পরায়ণ ছিলেন। যে সকল বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার আতিথেয়তার প্রতিদান দিতে পারিতেন, তিনি তাঁহাদেরই সেবা করিতেন, এমন নহে ; পরন্তু যাঁহারা প্রতিদান দিতে পারিতেন না, তাঁহাদিগেরই অধিকতর সেবা করিতেন। এই বিষয়ে তিনি ঈশার উপদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভবানীপুরস্থ ভবন পরামর্শ ও সাহায্যপ্রার্থিগণের সমাগমস্থল ছিল, এবং তিনি স্বকীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে অকাতরে পরামর্শ ও সাহায্য উভয়ই প্রদান করিতেন। ইহাই তাঁহার স্বদেশ-প্রেমিকতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কারণ, অন্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের বর্ত্ত-মান অবস্থায় যিনি নিঃস্বার্থভাবে দেশবাসীর দুঃখমোচন ও সুখবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রযত্ন করেন, তিনিই যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক। আত্মত্যাগে স্পৃহা না থাকিলে স্বদেশপ্রেমিকতা থাকিতে পারে না। যে অসাধারণ হিন্দু সম্প্রতি পরলোকে গমন করিলেন, তাঁহার জীবনই ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদিগের আন্তরিক বিশ্বাস এই যে, সেই বহুশিক্ষাপ্রদ জীবনের শিক্ষা আমাদিগের দেশবাসীর হৃদয়ে বিফল হইবে না। আমাদিগের আরও আশা এই যে, বহুসংখ্যক শিক্ষিত দেশবাসী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন, এবং তাঁহার দ্বিগুণ শক্তি ও উৎসাহের অধিকারী হইয়া দেশে নবজীবনসঞ্চার করিতে সক্ষম হইবেন। * ।৩৭০।

*সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩২০, পৃ, ৩৬১-৭০

নির্দেশিকা